ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

রচনা
মুহাম্মদ আবদুল মালেক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ড. মোহাম্মদ ইউছুফ
মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ
ইকবাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শরীফ

সম্পাদনা
ডক্টর মো. আখতারুজ্জামান
মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা–১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক
রেবেকা সুলতানা লিপি
মোঃ আনিছুর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ
কালার গ্রাফিক

প্রচ্ছদ
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন
আরিফুর রহমান তপু

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বোতমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

ইসলামের মূল স্তম্ভ ও বিধানসমূহ শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। একবিংশ শতকের এই সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে ইসলামের শাশ্বত বিধানসমূহকে জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের মানবতাবাদী জীবনদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমবোধ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, সহনশীলতা, উদারতা, শ্রমের মর্যাদা, পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও সাম্যের চেতনায় উজ্জীবিত হয় সেই দিক বিবেচনায় রেখে **ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা** শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	আকাইদ	১–২২
দ্বিতীয়	ইবাদত	২৩–৪৬
তৃতীয়	কুরআন ও হাদিস শিক্ষা	৪৭–৭৬
চতুর্থ	আখলাক	৭৭–৯৬
পঞ্চম	আদর্শ জীবনচরিত	৯৭–১১২

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ (اَلۡعَقَائِدُ)

আকাইদ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো আকিদাহ, অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের সর্বপ্রথম বিষয় হলো আকাইদ। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর ওপর মনে প্রাণে বিশ্বাস করাকেই আকাইদ বলা হয়।আকাইদের সবগুলো বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। অর্থাৎ তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করার নাম আকাইদ। যে এসব বিষয়ে বিশ্বাস করে,সে-ই ইসলামে প্রবেশকারী বা মুসলিম।

এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী–

- তাওহিদের মর্ম উপলব্ধি করে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কুফর ও শিরকের পরিচয়, কুফল এবং বাস্তব জীবনে এসব পরিহার করার উপায় বর্ণনা করতে পারবে।
- বাস্তব জীবনে কুফর ও শিরক পরিহার করে চলার অভ্যাস গঠন এবং নৈতিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত হবে।
- ইমান মুফাস্‌সাল (ইমানের বিস্তারিত পরিচয়) অর্থসহ শুদ্ধভাবে পড়তে ও বলতে এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- আল্লাহর গুণবাচক নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- আল্লাহর গুণবাচক নাম সম্পর্কিত গুণসমূহ নিজ আচরণে প্রতিফলনে আগ্রহী হবে।
- রিসালাতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ওহির পরিচয় ও এর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব এবং সিরাত ও মিজানের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।
- নৈতিক জীবনযাপনে তাওহিদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠ ১

তাওহিদ (اَلتَّوْحِيْدُ)

তাওহিদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। মহান আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করার নামই হলো তাওহিদ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা আলা এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনিই আমাদের রক্ষক, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিজিকদাতা। তিনি অনাদি অনন্ত। তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কিছুই নেই। তিনিই একমাত্র মাবুদ। সকল প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। মনে প্রাণে এরূপ বিশ্বাসকেই তাওহিদ বলা হয়।

গুরুত্ব

আকাইদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ ইমান ও ইসলামে প্রবেশ করে। তাওহিদে বা একত্ববাদে বিশ্বাসের পর আকাইদের অন্যান্য বিষয় বিশ্বাস করতে হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানবজাতির হেদায়াতের জন্য দুনিয়াতে অনেক নবি-রাসুল আগমন করেছেন। তাঁরা সকলেই তাওহিদের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। তাঁদের সকলের দাওয়াতের মূল বাণী ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই'। এমন কোনো নবি ছিলেন না যিনি তাওহিদের কথা বলেন নি। বরং সকল নবি-রাসুলই তাওহিদের শিক্ষা প্রচার করেছেন। ইসলামের সকল বিধি-বিধান তাওহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাওহিদের পরিপন্থী কোনো বিধান ইসলামে নেই। সালাত, যাকাত, সাওম, হজ -সকল ইবাদতই এক আল্লাহর জন্য করতে হয়। কোনো কিছু চাইতে হলেও এক আল্লাহর নিকট চাইতে হয়। এটাই ইসলামের শিক্ষা। অতএব, ইসলামে তাওহিদের গুরুত্ব অপরিসীম।

তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে সফলতা এনে দেয়। কেননা তাওহিদ মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দান করে। মানুষ আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও গুণাবলি জানতে পারে। মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের জন্য মানুষকে পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এ শিক্ষা তাওহিদের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। এ শিক্ষার দ্বারা মানুষ অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকলে এর ফলে সে আখিরাতে সফলতা লাভ করবে।

দুনিয়ার জীবনেও তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাওহিদে বিশ্বাসীগণ শুধু আল্লাহ তাআলার সামনে মাথা নত করে। অন্য কারো সামনে সে মাথা নত করে না। পক্ষান্তরে, তাওহিদে বিশ্বাস না করলে মানুষ বিপথগামী হয়ে যায়। সে গাছ-পালা, পশু-পাখি, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির নিকট মাথা নত করে। নানা মূর্তির পূজা করতে থাকে। ফলে মানুষের আত্মমর্যাদা বিনষ্ট হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্মসচেতনতা জাগিয়ে তোলে।

তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহ তাআলার প্রতি নির্ভরশীল করে। ফলে বিপদে-আপদে, দুঃখ-কষ্টে মানুষ হতাশ বা নিরাশ হয় না বরং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে পূর্ণোদ্যমে কাজ করতে থাকে এবং সাফল্য লাভ করে। এভাবে তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তি ও সফলতার দুয়ার খুলে দেয়।

তাওহিদের তাৎপর্য

কত বিশাল এ বিশ্বজগৎ। আমাদের পৃথিবী এর সামান্য অংশমাত্র। বড় বড় গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা, গ্যালাক্সি এ বিশ্বজগতে বিরাজমান। এগুলোর প্রত্যেকটিই সুশৃঙ্খলভাবে ঘুরছে। কোনোটি এর নির্ধারিত নিয়মের বাইরে যাচ্ছে না।

কে দিলেন এই নিয়ম? আমাদের পৃথিবী কত সুন্দর। এতে রয়েছে বিশাল আকাশ, বিস্তৃত মাঠ, বড় বড় পাহাড়-পর্বত, প্রবহমান নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর। এ সবকিছুই আপনা-আপনি সৃষ্টি হয় নি। কে এসবের সৃষ্টিকর্তা?

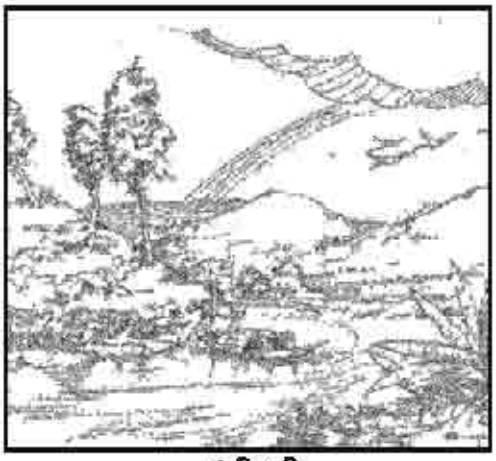

প্রকৃতির মাঝে

ফল খেতে আমরা সবাই ভালোবাসি। আম গাছে আম হয়, জাম গাছে জাম। আমরা কি কখনো কাঁঠাল গাছে আম কিংবা জামরুল ধরতে দেখেছি? কেউই দেখিনি। কারণ কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ছাড়া আর অন্য কোনো ফল হয় না। আমাদের চারপাশে রয়েছে নানারকম পশু-পাখি। কাক আমাদের অতিপরিচিত পাখি। কাক সবসময় কা কা করেই ডাকে। কাক কোনো দিন কোকিলের মতো ডাকে না। আবার গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল সবাই নিজ নিজ সুরেই ডাকাডাকি করে। আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি কেন এমন হয়? কেন এক পশু আরেক পশুর সুরে ডাকে না? গাছের ফল-ফসল, পশু-পাখির আহার-ব্যবস্থার এসব কে নিয়ন্ত্রণ করেন?

বস্তুত আল্লাহ তাআলাই এই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা। মহাজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁরই দান। পৃথিবীর সকল কিছুর স্রষ্টাও তিনিই। আর পশু-পাখি, গাছপালাসহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রকও তিনি। তিনিই সবকিছু করেন। বরং তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়। এসব কিছুতে যদি একের বেশি নিয়ন্তা থাকত, তবে নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ج

অর্থ : 'যদি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে, আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ২২)

একটু চিন্তা করলেই আমরা বিষয়টি বুঝতে পারব। যেমন মহাজগতের সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা যদি একাধিক হতেন, তাহলে মহাজগৎ এত সুশৃঙ্খলভাবে চলত না। একজন স্রষ্টা চাইতেন সূর্য পূর্ব দিকে উঠুক। আরেকজন চাইতেন পশ্চিম দিকে। আবার অন্যজন দক্ষিণ বা উত্তর দিকে সূর্যকে উদিত করতে চাইতেন। ফলে এক চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

এমনিভাবে আম গাছে আম না হয়ে কোনো কোনো সময় কাঁঠল, জাম ইত্যাদিও হতে পারত। এতে আমরা বেশ অসুবিধায় পড়তাম। বস্তুত একাধিক স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রক থাকলে বিশ্বজগতের সুন্দর সুশৃঙ্খল অবস্থা বিনষ্ট হয়ে যেত। আল-কুরআনের অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط

অর্থ : 'আর তাঁর (আল্লাহর) সাথে কোনো ইলাহ নেই। যদি তা থাকত,তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত।' (সুরা মুমিনুন, আয়াত ৯১)

এ আয়াতেও তাওহিদ বা একত্ববাদের তাৎপর্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নিচের উদাহরণের মাধ্যমে আমরা তা বুঝতে পারি। একাধিক স্রষ্টা থাকলে তারা তাঁদের সৃষ্টিকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতেন। যেমন আগুনের স্রষ্টা আগুন নিয়ে পৃথক হয়ে পড়তেন। অতঃপর সমস্ত কিছুকে আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দিয়ে তার নিজ ক্ষমতার প্রকাশ করতেন। তেমনি মহাসাগরের স্রষ্টা সারা পৃথিবী তার সৃষ্টি দ্বারা ডুবিয়ে দিতে চাইতেন। এভাবে স্রষ্টাগণ নিজ নিজ সৃষ্টি দ্বারা অন্যের ওপর বিজয়ী হতে চাইতেন। ফলে আমাদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেত। পৃথিবীর সকল কিছুই ধ্বংস হয়ে যেত।

এসব বর্ণনা এ কথাই প্রমাণ করে যে ইলাহ মাত্র একজনই। আর তিনি হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও পালনকর্তা। তাঁর হুকুম ও নিয়মেই সবকিছু পরিচালিত হয়। কোনো সৃষ্টিই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারে না। এসব কাজে তিনি একক ও অদ্বিতীয়। আন্তরিকভাবে এরূপ বিশ্বাসের নামই তাওহিদ বা একত্ববাদ।

আমরা তাওহিদের পরিচয় জানব। এতে বিশ্বাস স্থাপন করব। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে প্রকৃত ইমানদার হব।

কাজ : শিক্ষার্থী-

(ক) তাওহিদের তাৎপর্য পাঠকরে নিজের খাতায় মুখস্থ লিখবে এবং প্রত্যেকে তার পাশের বন্ধুকে দেখাবে।

(খ) তাওহিদে বিশ্বাসের ফলে ব্যক্তির জীবন ও কর্মে কী কী পরিবর্তন আসতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পা–২

কুফর (اَلْكُفْرُ)

কুফর আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, গোপন করা, ঢেকে রাখা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলা ও ইসলামের মৌলিক বিষয়সমুহের কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলে। যে ব্যক্তি কুফরে লিপ্ত হয়,তাকে বলা হয় কাফির (كَافِرٌ)।

কুফর হলো ইমানের বিপরীত। কুফরের নানা দিক রয়েছে। যেমন:

ক. আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করা।

খ. ইমানের মৌলিক অন্যান্য বিশ্বাসকে অস্বীকার করা। যথা:- নবি-রাসুল, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, পরকাল, তাকদির, পুনরুত্থান, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদিকে অবিশ্বাস করাও কুফর।

গ. ইসলামের মৌলিক ও ফরয ইবাদতগুলোকে অস্বীকার করাও কুফর। যেমন- সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি ইবাদত অস্বীকার করা।

ঘ. হালাল জিনিসকে হারাম মনে করাও কুফর। তেমনি হারাম বস্তুকে হালাল ধারণা করা কুফরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- কেউ যদি মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদিকে হালাল মনে করে, তবে সেও কুফরি করল।

কুফরের কুফল ও পরিণতি

কুফরের কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি নৈতিকতা ও মানবিক আদর্শের বিপরীত। কেননা, আল্লাহ তাআলা আমাদের স্রষ্টা। তিনিই আমাদের রিযিকদাতা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা। সুতরাং তাঁকে অবিশ্বাস করা কিংবা তাঁর বিধান অস্বীকার করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। এটি চরম অকৃতজ্ঞতার শামিল। কাফিরদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আখিরাতে কাফিরদের স্থান হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

অর্থ : 'যারা কুফরি করে এবং আমার নিদর্শনগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।' (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৯)

কাফিরদের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। অবশ্য কাফির ব্যক্তি যদি পুনরায় ইমান আনে এবং ইসলামের সমস্ত মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে সে এ শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে। সাথে সাথে তাকে অবশ্যই পূর্ববর্তী কুফরি কাজের জন্য আন্তরিকভাবে লজ্জিত হতে হবে এবং খাঁটি মনে তাওবা করতে হবে।

অতএব আমরা কুফর ও এর কুফল সম্পর্কে জেনে এ থেকে বেঁচে থাকব। এ জন্য সদাসর্বদা সতর্ক থাকব। আল্লাহ তাআলার নিকট কুফর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করব।

কাজ : কুফরের কুফল ও পরিণতি সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখে একটি পোস্টার বাড়ি থেকে তৈরি করে নিয়ে আসবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩

শিরক (اَلشِّرْكُ)

শিরক শব্দের অর্থ অংশীদার করা, সমকক্ষ মনে করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার করাকে শিরক বলে। অপর কোনো কিছুকে আল্লাহ তাআলার সমতুল্য বা সমকক্ষ মনে করাও শিরক। যে ব্যক্তি

শিরক করে,তাকে বলা হয় মুশরিক (مُشْرِكٌ)।

তাওহিদের বিপরীত হলো শিরক। তাওহিদ হলো একত্ববাদ। আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়-এরূপ বিশ্বাসকে তাওহিদ বলে। পক্ষান্তরে শিরক হলো,আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদার করা। কিংবা কাউকে আল্লাহর সমপর্যায়ের মনে করা। শিরক প্রধানত তিন প্রকার। যথা:

ক. আল্লাহ তাআলার সত্তার সাথে শিরক করা। যেমন- আল্লাহ তাআলার পিতা, পুত্র কিংবা স্ত্রী আছে- এরূপ বিশ্বাস রাখা।

খ. আল্লাহ তাআলার গুণাবলিতে অংশীদার করা। যেমন- সৃষ্টিকর্তা একজন না মেনে একাধিক সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করা।

গ. আল্লাহ তাআলার ইবাদতে শিরক করা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত না করে অন্য কারো ইবাদত করা। যেমন- অগ্নি ও মূর্তিপুজা করা।

শিরকের কুফল ও পরিণতি

শিরক হলো জঘন্যতম অপরাধ। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ○

অর্থ : 'নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম।' (সুরা লুকমান, আয়াত ১৩)

শিরকের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তাআলার সাথে অন্যায় আচরণ করে। কেননা আল্লাহ তাআলাই মানুষের একমাত্র স্রষ্টা। সকল ইবাদত ও প্রশংসা লাভের হকদারও তিনিই। শিরকের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত করে। ফলে আল্লাহর সাথে চরম অন্যায় করা হয়।

অন্যদিকে শিরক মানবতাবিরোধী অপরাধও বটে। কেননা মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ তাআলা সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অথচ মুশরিকরা শিরকে লিপ্ত হয়ে অন্য সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে। ফলে মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। এ জন্যই কুরআন মাজিদে শিরককে সবচেয়ে বড় যুলুম বলা হয়েছে।

শিরকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। তিনি বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ط

অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্য যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সুরা আন-নিসা, আয়াত ১১৬)

আমরা শিরক ও এর কুফল সম্পর্কে ভালোভাবে জানব এবং সদাসর্বদা এ জঘন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব। আমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনদেরকে শিরকের কুফল ও শোচনীয় পরিণতির কথা বলে সতর্ক করব।

কাজ : শিক্ষার্থী শিরক পরিহার করার উপায়সমূহের একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৪

ইমান মুফাস্‌সাল (اَلْاِيْمَانُ الْمُفَصَّلُ)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

উচ্চারণ: আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি, ওয়া কুতুবিহি, ওয়া রুসুলিহি, ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি, ওয়াল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত।

অর্থ : আমি ইমান আনলাম-

১. আল্লাহর প্রতি,

২. তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি,

৩. তাঁর কিতাবগুলোর প্রতি,

৪. তাঁর রাসুলগণের প্রতি,

৫. আখিরাতের প্রতি,

৬. তাকদিরের প্রতি,যার ভালো–মন্দ আল্লাহ তাআলার নিকট থেকেই হয় এবং

৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য

ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। আর মুফাসসাল অর্থ বিস্তারিত। ইমান মুফাসসাল অর্থ বিস্তারিত বিশ্বাস। বিস্তারিতভাবে ইমানের বিষয়গুলোর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথকভাবে সবকটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি। উক্ত বাক্যে ইমানের সাতটি বিষয়ের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে এ সাতটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো-

১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

ইমানের সর্বপ্রথম বিষয় হলো মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। পূর্বের শ্রেণিতে আমরা ইমানে মুজমাল সম্পর্কে জেনেছি। সেখানে আল্লাহ তাআলার প্রতি কিরূপ বিশ্বাস করতে হবে তা বলা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাসই ইমানের মূল। আমরা আল্লাহ তাআলার তাওহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস করব। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে একক ও অতুলনীয়। তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউ নেই। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণ রয়েছে। তিনিই একমাত্র মাবুদ। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ-ই ইবাদতের যোগ্য নয়।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা নূরের তৈরি। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ তাআলার যিকির ও তাসবিহ পাঠে রত।

তাঁদের সংখ্যা অগণিত। আল্লাহ তাআলার হুকুম ব্যতীত তারা কোনো কাজই করেন না।

আল্লাহর নির্দেশ পালনই তাঁদের একমাত্র কাজ। ফেরেশতাগণের মধ্যে চারজন রয়েছেন নেতৃস্থানীয়। তারা হলেন: (১) হযরত জিবরাইল (আ.), যিনি আল্লাহর বাণী নবি-রাসুলগণের নিকট পৌঁছে দিতেন। (২) হযরত মিকাইল (আ.), যিনি আল্লাহর হুকুমে মানুষ ও জীবজন্তুর জীবিকা বণ্টন কাজে নিয়োজিত আছেন। (৩) হযরত আযরাইল (আ.), যিনি মানুষ ও জিনদের মৃত্যু ঘটানো বা রুহ কবয করার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আছেন। (৪) হযরত ইসরাফিল (আ.), যিনি সিঙ্গা নিয়ে আল্লাহর নির্দেশের জন্য প্রস্তুত আছেন। আল্লাহর আদেশ পাওয়ামাত্রই সিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন। এতে দুনিয়া ও এর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর দ্বিতীয়বার ফুৎকারে আবার সবাই জীবন ফিরে পেয়ে আখিরাতের ময়দানে বিচারের জন্য আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। অন্য সব ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হুকুম পালনে রত আছেন।

৩. কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তাআলা বহু আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলো সবই আল্লাহর কালাম বা বাণী। তিনি নবি-রাসুলগণের মাধ্যমে এ কিতাবগুলো মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন। এসব কিতাব মানবজাতির জন্য আলোস্বরূপ। এসবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব হলো আল-কুরআন। এসব কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতরণ করা হয়েছে, এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে।

৪. রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস

মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহ তাআলার পরিচয় দান করেছেন। সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়েছেন। তাঁরা নিজ থেকে এসব করেননি। বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েই তাঁরা তাওহিদের বাণী প্রচার করতেন। তাঁদেরকে আল্লাহর প্রেরিত নবি ও রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে।

৫. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ নয়। বরং আখিরাতের জীবনও রয়েছে। আখিরাত হলো পরকাল। মৃত্যুর পরপরই এ জীবনের শুরু। মানুষ সেখানে দুনিয়ার ভালো কাজের জন্য জান্নাত লাভ করবে এবং মন্দ কাজের জন্য জাহান্নাম পাবে। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসও ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৬. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস

তাকদিরকে আমরা ভাগ্য বা নিয়তি বলে থাকি। সবকিছুর তাকদিরই আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তাআলাই তাকদিরের নিয়ন্ত্রক। তাকদিরের ভালো-মন্দ যাই ঘটুক, সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তাকদির একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। সুতরাং আমরা তাকদিরে বিশ্বাস করব এবং ভালো ফল লাভের জন্য চেষ্টা করব।

৭. পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস

মৃত্যু একটি অনিবার্য সত্য। সকল জীবিত প্রাণীকেই মরতে হবে। আবার এমন একসময় আসবে, যখন আল্লাহ তাআলা সবকিছু ধ্বংস করে দেবেন। পৃথিবীর কোনো কিছুই সেদিন অবশিষ্ট থাকবে না। কেবল আল্লাহ তাআলাই থাকবেন। এরপর একসময় আল্লাহ তাআলা পুনরায় সবাইকে জীবিত করবেন। মৃত্যুর পর পুনরায় এ জীবিত হওয়াকেই পুনরুত্থান

বলে। এসময় সবাইকে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে এবং দুনিয়ার সকল কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উপর্যুক্ত সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এর যেকোনো একটির প্রতিও অবিশ্বাস করা যাবে না। এর কোনো একটিকেও অবিশ্বাস করলে মানুষ মু মিন হতে পারবে না। আমরা ইমান মুফাস্সালে বর্ণিত সাতটি বিষয় সম্পর্কে জানব। এগুলোর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করব।

কাজ : (ক) প্রত্যেকে পাশের একজন বন্ধুকে ইমান মুফাস্সাল অর্থসহ মুখস্থ শোনাবে।

(খ) ইমান মুফাস্সালের সাতটি বিষয়কে সাতটি লাইনে লিখে একটি রঙিন পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ৫

আল–আসমাউল হুসনা (اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى)

পরিচয়

আল্লাহ তাআলা সকল গুণের অধিকারী। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা, দয়াবান, ক্ষমাশীল, শাস্তিদাতা ও পরাক্রমশালী। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান। তিনিই মালিক। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ج

অর্থ : 'কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়।' (সুরা আশ-শুরা, আয়াত ১১)

আল্লাহ তাআলা অতুলনীয়। তাঁর সত্তা যেমন অনাদি ও অনন্ত, তাঁর গুণাবলিও তেমনি অনাদি ও অনন্ত। আল্লাহ তাআলার এসব গুণ নানা শব্দে নানা উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়। এসব গুণের এক পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। এ নামগুলোকেই একত্রে আল আসমাউল হুসনা বলা হয়। এই পাঠে আমরা আল্লাহ তাআলার কতিপয় গুণবাচক নামের পরিচয় লাভ করব।

প্রভাব

মানবজীবনে আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহের প্রভাব অপরিসীম। কেননা এসব গুণবাচক নাম মানবজীবনে দুদিক থেকে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রথমত: এসব নামের দ্বারা আমরা আল্লাহ তাআলাকে চিনতে পারি। তাঁর ক্ষমতা ও গুণাবলির পরিচয় পাই। যেমন- রাহমান, রাহিম নাম দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ তাআলা দয়াবান। গাফফার নাম দ্বারা বুঝি যে মহান আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল। সুতরাং পাপ করে ফেললে আমরা তাঁর নিকট ক্ষমা চাই। তিনিই পারেন সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করতে।

অন্যদিকে তিনিই হলেন জাব্বার (প্রবল), কাহ্হার (মহাপরাক্রান্ত)। এগুলো স্মরণ থাকলে আমরা কোনো পাপ কাজ করতে

পারি না। কেননা আমরা বুঝতে পারি যে পাপ কাজ করলে তিনি আমাদের শাস্তি দেবেন। তাছাড়া আল্লাহ তাআলাই রিযিকদাতা, নিয়ামতদাতা, করুণাময়। ফলে আমরা তাঁর নিয়ামত উপভোগ করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহ আমাদেরকেও উত্তম গুণাবলি অর্জনে উৎসাহিত করে।

সুতরাং আমরাও আমাদের জীবনে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করব। যেমনঃ আল্লাহ পাক দয়ালু, আমরাও সকলের প্রতি দয়া করব, তিনি ন্যায়পরায়ণ,আমরাও সকল ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হব। তিনি রিযিকদাতা। আমরাও ক্ষুধার্তকে অন্ন দেব। আল্লাহ তাআলা পরম ধৈর্যশীল। আমরাও বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করব। এভাবে আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহ আমাদেরকে উত্তম চরিত্রবান হতে উৎসাহিত করে।

আল্লাহু হায়্যুন (اَللّٰهُ حَيٌّ)

হায়্যুন শব্দের অর্থ চিরঞ্জীব। যিনি চিরকাল ধরে জীবিত। আল্লাহু হায়্যুন অর্থ আল্লাহ চিরঞ্জীব। তিনি চিরকাল ধরে আছেন, থাকবেন। যখন কোনো কিছুই ছিল না,তখনও তিনি ছিলেন। আবার কিয়ামতে যখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে,তখনও তিনিই থাকবেন। তাঁর কোনো ক্ষয় নেই, রোগ-শোক, দুঃখ-জরা, তন্দ্রা-নিদ্রা কিছুই নেই। কোনোরূপ ধ্বংস তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না। তিনি সকল ক্ষয় ও ধ্বংস থেকে মুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ

অর্থ : 'তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না।' (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫)

আমরা আল্লাহ তাআলার এ গুণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। সকল কাজকর্মে আমরা প্রাণবন্ত থাকব। অলসতা, নির্জীবতা পরিহার করব। ক্লান্তি, শ্রান্তি, তন্দ্রা, নিদ্রা ইত্যাদি যেন আমাদের কাজে কোনো প্রভাব না ফেলে সে চেষ্টা করব। তাহলে আমরা সফলতা লাভ করব।

আল্লাহু কায়্যুমুন (اَللّٰهُ قَيُّوْمٌ)

কায়্যুমুন শব্দের অর্থ চিরস্থায়ী, চিরবিরাজমান, চিরবিদ্যমান, সবকিছুর ধারক সত্তা। ইসলামি পরিভাষায় সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সত্তা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান,তিনিই কাইয়্যুম। অন্যকথায় আপন সত্তার জন্য যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন অথচ সকল সত্তার ধারক,এরূপ সত্তাকে কাইয়্যুম বলা হয়। আল্লাহু কায়্যুমুন অর্থ আল্লাহ চিরস্থায়ী। তিনিই সবকিছুর ধারক। তিনি বিশ্ববিধাতা। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আসমান-জমিনের সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

আল্লাহ তাআলা চিরবিরাজমান। তিনি সবসময় বিদ্যমান। তিনি অনাদি-অনন্ত। তিনি সবকিছু জানেন। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।

তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং নিপুণভাবে পরিচালনা করেন। কিয়ামত পর্যন্ত সবকিছুর রক্ষক তিনিই। আখিরাতেও তিনিই একমাত্র নিয়ন্ত্রক। তিনি ব্যতীত আর কোনো চিরবিরাজমান সত্তা নেই।

আল্লাহু আযিযুন (اَللّٰهُ عَزِيْزٌ)

আযিযুন শব্দের অর্থ মহাপরাক্রমশালী। আল্লাহ তাআলাই সকল ক্ষমতার উৎস ও মালিক। তাঁর ক্ষমতা অসীম। তাঁর

ক্ষমতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কেউ তাঁর ক্ষমতার মোকাবিলা করতে পারে না। আল কুরআনে এসেছে-

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

অর্থ : 'আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, দণ্ডদানকারী।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৪)

আল্লাহ তাআলা অসীম ক্ষমতাধর। কেউ তাঁকে অপারগ করতে পারে না। তাঁর সাথে ধোঁকা-প্রতারণা করতে পারে না। কেউ তাঁর কৌশল বা পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে পারে না। তিনি যা চান তা-ই হয়। তার কুদরত বা ক্ষমতার মোকাবিলা করার শক্তি কারো নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে পারেন। দুনিয়ার বড় বড় ক্ষমতাবানদের তিনি ক্ষুদ্র প্রাণী বা বস্তু দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। যেমন তিনি ফেরাউনকে পানি দ্বারা, নমরুদকে মশা দ্বারা, আবরাহাকে ছোট ছোট পাখি দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাঁকে অস্বীকারকারী কেউই তাঁর আযাব বা শাস্তি থেকে বাঁচতে পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে না।

আমরা সদাসর্বদা আল্লাহ তাআলার এসব গুণের কথা মনে রাখব। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করব। তাহলে সৎকাজ করা আমাদের জন্য সহজতর হবে।

আল্লাহু খাবিরুন (اَللّٰهُ خَبِيرٌ)

খাবিরুন অর্থ সম্যক অবহিত। আল্লাহ খাবিরুন অর্থ আল্লাহ তাআলা সবকিছু সম্যক অবহিত, সবকিছু জানেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○

অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন, সকল খবর রাখেন।' (সুরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন। তিনি সকল বিষয়েই সম্যক অবহিত। কোনো কিছুই তাঁর নিকট অজানা নয়। আমরা যা বলি বা করি সবই তিনি জানেন। এমনকি আমরা যেসব বিষয়ের কল্পনা করি,তাও তাঁর অজানা নয়। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বস্তু বা প্রাণীর খবরও তিনি জানেন। গভীর সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর খবরও তাঁর জানা। অন্ধকার রাতে কালো পাথরের ওপর কালো পিপীলিকার চলাফেরাও তাঁর অজানা নয়। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার মতো খালি চোখে যেসব প্রাণী দেখা যায় না,সে সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবহিত। এককথায় আসমান-জমিন ও এ বিশ্বজগতের এমন কোনো জিনিস নেই যা তাঁর জ্ঞানের বাইরে। তিনি সবকিছু জানেন।

আমরা আল্লাহ তাআলার এ গুণের তাৎপর্য উপলব্ধি করব। সবসময় মনে রাখব যে তিনি আমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে জানেন। আমাদের সব পাপ-পুণ্য কিছুই তাঁর অজানা নয়। আমরা অন্যায় থেকে বিরত থাকব এবং তাঁর ভালোবাসা অর্জন করব।

আল্লাহু সাবুরুন (اَللّٰهُ صَبُورٌ)

সাবুরুন শব্দের অর্থ মহাধৈর্যশীল। আল্লাহ সাবুরুন অর্থ আল্লাহ মহাধৈর্যশীল। আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় ধৈর্যশীল। তাঁর ধৈর্যের কোনো সীমা নেই।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে নানা নিয়ামত দান করেছেন। তিনিই মানুষকে রিযিক দেন, লালন-

পালন করেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় খাদ্য-পানীয় দেন। ভয়-ভীতিতে নিরাপত্তা দান করেন। আলো, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, পানি সবকিছু তাঁরই দান। সুন্দর এ পৃথিবীর সবকিছুই তিনি মানুষের কল্যাণে দান করেছেন। এতকিছুর পরও অনেক মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করে না। তাঁর নাফরমানি করে। তাঁর ইবাদত ছেড়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা এসব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেন। তিনি মানুষকে নিয়ামত দান বন্ধ করে দেন না। নাফরমানি করলে তিনি যদি আলো বা পানি বন্ধ করে দিতেন, তাহলে সকলে ধ্বংস হয়ে যেত। নাফরমানদেরকে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিও দেন না। বরং তিনি সুযোগ দেন। মানুষ যদি তাওবা করে ফিরে আসে, তবে তিনি ক্ষমা করে দেন। এরপর যদি মানুষ আবার পাপ করে তিনি পুনরায় ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করেন। বান্দা যদি আবার তাওবা করে তিনি পুনরায় ক্ষমা করেন। আল্লাহ ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। তিনি সর্বদা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ○

অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সাথে রয়েছেন।' (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৩)

ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ জান্নাত দান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ۙ○

অর্থ : 'তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে।' (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৫)

আমরাও আল্লাহ তাআলার এগুণের অনুশীলন করব। অধীনদেরকে ক্ষমা করব। বিপদে-আপদে নিরাশ হব না, বরং ধৈর্যধারণ করব।

কাজ : শিক্ষার্থী দলে বিভক্ত হয়ে মহান আল্লাহর দশটি গুণবাচক নাম অর্থসহ লিখে একটি পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৬

রিসালাত (اَلرِّسَالَةُ)

রিসালাত অর্থ বার্তা, সংবাদবহন, চিঠি, খবর পৌঁছানো ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার বাণী ও পরিচয় মানুষের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্বকে রিসালাত বলে।

আল্লাহ তাআলা মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই একমাত্র রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা। কিন্তু মানুষ নিজে থেকে আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করতে পারে না। বুদ্ধি-বিবেক খাঁটিয়ে মানুষ বুঝতে পারে যে এ মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন। কিন্তু তিনি কেমন, তাঁর গুণাবলি কিরূপ, তাঁর ক্ষমতা কত-এসব কিছুই মানুষ নিজে নিজে জানতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন পথপ্রদর্শকের। আল্লাহ তাআলা নিজেই মানুষের মধ্য থেকে এসব পথপ্রদর্শক নিয়োগ করেছেন। তাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহ তাআলার সঠিক পরিচয় তুলে ধরার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা তাওহিদ ও আখিরাত সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার বাণী ও আদেশ-নিষেধ মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। এসব দায়িত্বকেই অন্য কথায়

রিসালাত বলা হয়। যাঁরা এসব দায়িত্ব পালন করেন,তাঁরা হলেন নবি কিংবা রাসুল। সৎপথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ সকল জাতির নিকট নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً

অর্থ : 'এবং আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি।' (সুরা আন-নাহল, আয়াত ৩৬)

নবি-রাসুলগণ আল্লাহ তাআলার মনোনীত বান্দা। তাঁরা পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁরা সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

রিসালাতে বিশ্বাস করা ইমানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাওহিদে বিশ্বাস করার সাথে সাথে আমাদের রিসালাতেও বিশ্বাস করতে হবে। কেননা রিসালাতে বিশ্বাস না করলে মুমিন হওয়া যায় না।

নবি-রাসুলগণ রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ তাআলা ও মানবজাতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী। তাঁদের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ তাআলার সঠিক পরিচয় পাই। তাঁরাই আমাদের নিকট মহান আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রিসালাত ও নবি-রাসুলগণের ওপর বিশ্বাস করা অপরিহার্য। তাঁদেরকে অস্বীকার করলে ইমানের সকল বিষয়ই অস্বীকার করা হয়। যেমন- তোমার কোনো বন্ধু কারো মাধ্যমে তোমার নিকট কোনো সংবাদ প্রেরণ করল। এক্ষেত্রে সংবাদ বাহকের প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাহলেই কেবল বাহকের আনীত সংবাদ বিশ্বাস করা যাবে। কেননা সংবাদ বাহককে বিশ্বাস করা না গেলে তার আনীত সংবাদও বিশ্বাস করা যায় না। এতে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ফলে তোমার বন্ধুর উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না।

তদ্রূপ নবি-রাসুলগণ হলেন সংবাদ বাহকের ন্যায়। তারা আল্লাহ তাআলার বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। যদি আমরা তাঁদের অস্বীকার বা অবিশ্বাস করি, তাহলে তাঁদের আনীত কিতাব ও বর্ণনার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তাআলা, আখিরাত, কিয়ামত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবিশ্বাস জন্ম নেবে। সুতরাং সর্বপ্রথম তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আল্লাহ তাআলাই তাঁদেরকে সংবাদ বহনের জন্য মনোনীত করেছেন,এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে। তবেই আমরা পূর্ণভাবে ইমানের সব বিষয়ের প্রতি সমভাবে বিশ্বাস করতে পারব। সুতরাং বুঝা গেল, রিসালাতে বিশ্বাস করার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা সকল নবি-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস করব। কাউকে অবিশ্বাস করব না। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

অর্থ : 'আমরা তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।' (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৫)

অর্থাৎ আমরা সকলের প্রতিই বিশ্বাস করি। কারো প্রতি অবিশ্বাস করি না। নবি-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস করা ফরয। তাঁদেরকে অবিশ্বাস করলে ইমানদার হওয়া যায় না। বরং আমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নবি-রাসুলগণের কথায় বিশ্বাস না করে আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব আমরা সমস্ত নবি-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব।হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে চলব।

কাজ : শিক্ষার্থী রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য পাঠটি নীরবে পড়বে। অতঃপর এ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

ওহি (الْوَحْيُ)

ওহি (وَحْيٌ) আরবি শব্দ। এর অর্থ ইশারা, ইঙ্গিত, গোপন কথা ইত্যাদি। সাধারণত কোনো ব্যক্তির নিকট গোপনে প্রেরিত সংবাদকে ওহি বলা হয়।

ইসলামি পরিভাষায়, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি-রাসুলগণের নিকট প্রেরিত সংবাদ বা বাণীকে ওহি বলা হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর আল-কুরআন নাযিল করেছেন। সুতরাং আল-কুরআন হলো একপ্রকার ওহি।

ওহি অবতরণ

আল্লাহ তাআলা নানাভাবে নবি-রাসুলগণের নিকট ওহি প্রেরণ করতেন। তন্মধ্যে দুটি পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ।

ক. ফেরেশতার মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণী ফেরশতার মাধ্যমে নবি-রাসুলগণের নিকট পৌছাতেন। যেমন- হযরত জিবরাইল (আ.) হলেন প্রধান ওহিবাহক ফেরেশতা। তিনি নবি-রাসুলগণের নিকট আল্লাহ তাআলার বাণী নিয়ে হাজির হতেন।

খ. সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে। অনেক সময় আল্লাহ তাআলা সরাসরি নবি-রাসুলগণের সাথে কথা বলতেন। যেমন- আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে তুর পাহাড়ে কথা বলেছেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.) ও মিরাজের রজনীতে আল্লাহ তাআলার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।

প্রকারভেদ : ওহি প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

ক. ওহি মাতলু : অর্থাৎ যে ওহি তিলাওয়াত করা হয়। যেমন- কুরআন মাজিদ। কুরআন মাজিদ সালাতে তিলাওয়াত করা হয় বলে একে ওহি মাতলু বলা হয়।

খ. ওহি গায়র মাতলু : অর্থাৎ যে ওহি তিলাওয়াত করা হয় না। যেমন- হাদিস শরিফ। হাদিস শরিফ সালাতে তিলাওয়াত করা হয় না। এ জন্য একে ওহি গায়র মাতলু বলে।

মহানবি (স.)-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদনকে হাদিস বলে। হাদিসও ওহির অন্তর্ভুক্ত। কেননা মহানবি (স.) নিজ থেকে কিছু বলতেন না বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েই তিনি কথা বলতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ○

[**অর্থ :** 'আর তিনি (হযরত মুহাম্মদ স.) মনগড়া কোনো কিছু বলেন না। বরং এটা তো ওহি,যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।'] (সুরা আন-নাজম, আয়াত ৩-৪)

গুরুত্ব

ওহি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওহি সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়। এটা হলো অকাট্য জ্ঞান। এতে কোনোরূপ ভুলত্রুটি নেই। ওহির সংবাদ সকল প্রকার সন্দেহের ঊর্ধ্বে। ওহি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সকল প্রকার জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতারিত বলে এ জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ ও অতুলনীয়। আমরা নিজেদের গৃহ সম্পর্কে ভালোভাবে জানি। আমাদের গৃহে কোথায় কোন জিনিস রাখা আছে তা আমরাই সবচেয়ে ভালো বলতে পারব। বাইরের কেউ তা পারবে না। তদ্রূপ আমরাও অন্যের ঘরে কোথায় কী আছে তা বলতে পারব না। তেমনিভাবে আল্লাহ সারা বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তিনি নিজ কুদরতে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁর হুকুমেই সকল কিছু পরিচালিত হয়। পৃথিবীর কোথায় কোন জিনিস কী অবস্থায় আছে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। প্রত্যেক জিনিসের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি অবহিত। সুতরাং তিনি যে সংবাদ-জ্ঞান নাযিল করেন তা অকাট্য। কেউ এরূপ জ্ঞান খণ্ডন করতে পারে না।

আল-কুরআন ও হাদিস ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত। এগুলোর মাধ্যমেই আমরা ইসলামের সকল বিধি-বিধান জানতে পারি। তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির জ্ঞানও আমরা এগুলো থেকেই লাভ করি। এগুলো না থাকলে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। সুতরাং ওহির গুরুত্ব অপরিসীম। ওহির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে মানুষের ইমান পূর্ণাঙ্গ হয়।

কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হয়ে একদল ওহির অর্থ ও প্রকার সম্পর্কে মুখস্থ বলবে এবং অন্যদল ওহির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবে। আবার প্রথম দল গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবে,দ্বিতীয় দল ওহির অর্থ ও প্রকার সম্পর্কে মুখস্থ বলবে।

পাঠ ৮

আখিরাত (اَلْاٰخِرَةُ)

আখিরাত অর্থ পরকাল। পরকাল হলো ইহকালের বা দুনিয়ার জীবনের পরের জীবন। দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ জীবন নয়। বরং মানুষের জন্য আর একটি জীবন রয়েছে। সে জীবনই পরকালীন জীবন। পরকালীন জীবন অনন্ত। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ○

অর্থ : 'এ দুনিয়ার জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্তুমাত্র। আর নিঃসন্দেহে আখিরাতই হলো চিরস্থায়ী আবাস।' (সুরা মুমিন, আয়াত ৩৯)

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আখিরাতে বিশ্বাস ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আখিরাতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য। আখিরাত অবিশ্বাস করলে মানুষ

ইমানদার হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেন-

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

অর্থ : 'আর তারা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে।' (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ৪)

আখিরাত হলো পরকাল। কবর, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাতের একেকটি পর্যায়। এ সবকটি বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে ইমান আনতে হবে। কোনোটিই অবিশ্বাস করা যাবে না। বলা হয়ে থাকে, اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ
অর্থ : 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।'

অর্থাৎ দুনিয়া হলো আমল করার স্থান। আখিরাত হলো ফলভোগের স্থান। সেখানে মানুষ কোনো আমল করতে পারবে না। বরং দুনিয়াতে মানুষ যেরূপ আমল করেছে সেরূপ ফল ভোগ করবে। কৃষক শস্যক্ষেত্রে যেরূপ চাষাবাদ করে, সেরূপই ফল লাভ করে। জমিতে ধান লাগালে ফসল হিসেবে ধানই পাওয়া যায়। আর কেউ যদি জমিতে কাঁটাগাছ রোপণ করে তবে সে শুধু কাঁটাই লাভ করে। দুনিয়ার জীবনও তদ্রূপ। আর দুনিয়াতে যে ব্যক্তি ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, সে আখিরাতে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে। তাঁর আবাসস্থল হবে চিরশান্তির স্থান জান্নাত। অন্যদিকে যে ব্যক্তি ইমান আনবে না এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ করবে, আখিরাতে শাস্তি ভোগ করবে। তার ঠিকানা হবে শাস্তি ভোগের স্থান জাহান্নাম। সে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল পুড়বে। আখিরাতে কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করবে না। বরং চিরকাল ধরে শাস্তি অথবা শাস্তি ভোগ করবে।

আখিরাতে বিশ্বাস করলে মানবজীবন সুন্দর হয়। মানুষ উত্তম চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সবধরনের খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। এ বিশ্বাসের ফলে মানুষ কোনোরূপ অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, অশ্লীল কাজকর্ম করতে পারে না। বরং সে সর্বদা উত্তম ও নেক কাজে আগ্রহী হয়। আখিরাতে শান্তির আশায় মানুষ দুনিয়াতে ভালো গুণাবলির অনুশীলন করে। ফলে মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতএব, আমরা আখিরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করব। আখিরাতে শান্তি ও সফলতা লাভের জন্য দুনিয়ায় নেক আমল করব। আমাদের দুনিয়ার জীবন শান্তিময় হবে। আর পরকালে আমরা জান্নাত লাভ করব।

সিরাত (اَلصِّرَاطُ)

সিরাত শব্দের অর্থ পথ, রাস্তা, পুল, পদ্ধতি ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সিরাত হলো জাহান্নামের ওপর স্থাপিত একটি পুল। এ পুল পার হয়ে জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আখিরাতে সকল মানুষকেই এ পুলের ওপর আরোহণ করে তা অতিক্রম করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। যে নেক আমল করবে মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। জান্নাতিগণ সিরাতের ওপর দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁদের আমল অনুসারে সিরাত নানারকম হবে। কারো জন্য সিরাত হবে বিশাল ময়দানের মতো। আবার কম নেককারদের জন্য তাঁদের আমল অনুসারে সিরাতের প্রশস্ত কম হবে। ইমানদারগণ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী সিরাত অতিক্রম করবেন। কেউ বিদ্যুৎগতিতে সিরাত পার হবেন। কেউ ঝড়ের গতিতে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, কেউবা দৌড়ের গতিতে, আবার কেউ হেঁটে হেঁটে সিরাত পার হবেন। কম আমলকারী জান্নাতিগণ হামাগুড়ি দিয়ে অতিকষ্টে সিরাত পার হবেন।

সিরাত হলো অন্ধকার পুল। সেখানে ইমান ও নেক আমল ব্যতীত আর কোনো আলো থাকবে না। সুতরাং দুনিয়ায় যে দৃঢ় ইমান এবং বেশি নেক আমলের অধিকারী হবে, সিরাত হবে তাঁর জন্য সবচেয়ে বেশি আলোকিত। ইমানের আলোতে সে

সহজেই সিরাত অতিক্রম করবে। জান্নাতিগণের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁর পূর্বে কেউই এ মর্যাদা লাভ করবে না।

অন্যদিকে জাহান্নামিদের জন্য সিরাত অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। তাঁদের জন্য সিরাত হবে চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম এবং তরবারির অপেক্ষা ধারালো। সেখানে কোনো আলো থাকবে না। বরং সিরাত হবে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এমন অবস্থায় তারা সিরাতে আরোহণ করবে। তারা কিছুতেই সিরাত অতিক্রম করতে পারবে না। বরং তাঁদের হাত-পা কেটে তারা জাহান্নামে পতিত হবে।

সিরাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞

অর্থ : 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।' (সুরা মারইয়াম, আয়াত ৭১)

এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

يُوْضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ

অর্থ : 'জাহান্নামের ওপর সিরাত স্থাপিত হবে।' (মুসনাদে আহমাদ)

আমরা সিরাতে বিশ্বাস করব। সহজে সিরাত অতিক্রম করার জন্য দুনিয়াতে বেশি বেশি নেক আমল করব।

মিযান (اَلْمِيْزَانُ)

মিযান অর্থ দাড়িপাল্লা, তুলাদণ্ড, মানদণ্ড বা পরিমাপ করার যন্ত্র। ইসলামি পরিভাষায় যে পরিমাপক যন্ত্রের দ্বারা কিয়ামতের দিন মানুষের পাপ-পুণ্যকে ওজন করা হবে, তাকে মিযান বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ

অর্থ : 'আর আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব।' (সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ৪৭)

আমরা নিশ্চয়ই দাড়িপাল্লা দেখেছি। এর দুটি পাল্লা থাকে এবং মাঝে একটি দণ্ড থাকে। এগুলোর মাধ্যমে আমরা নানা জিনিস পরিমাপ করে থাকি। মিযানও তেমনি একটি মানদণ্ড। এর দুটি পাল্লাতে মানুষের সকল আমল ওজন করা হবে। এর এক পাল্লায় থাকবে পুণ্য এবং অন্য পাল্লায় উঠনো হবে পাপ। যে ব্যক্তির পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে সে হবে জান্নাতি। আর যে ব্যক্তির পুণ্যের পাল্লা হালকা হবে এবং পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে জাহান্নামি হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۞

অর্থ : 'এবং যাদের পাল্লা (পুণ্যের) ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।' (সুরা মু মিনুন, আয়াত ১০২-১০৩)

মিযানের পাল্লায় পুণ্য বা নেক কাজ বেশি হলে মানুষ সফলতা লাভ করবে। তার স্থান হবে জান্নাত। এ জন্য বেশি বেশি নেক কাজ করা উচিত। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আমাদের নেকির পাল্লা ভারী করার জন্য বহু আমল শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ

অর্থ : 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা মিযানের নেকির পাল্লা পূর্ণ করে দেয়।' (সহিহ মুসলিম)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন- 'দুটি বাক্য এমন আছে, যা দয়াময় আল্লাহর নিকট প্রিয়, উচ্চারণে সহজ এবং মিযানের পাল্লায় ভারী। এ দুটি বাক্য হলো-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম।

অর্থ : 'পবিত্রতা ও প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি মহান ও অতিশয় পবিত্র।'

আমরা এ দোয়া দুটি শিখব এবং বেশি বেশি পাঠ করব। এতে আমাদের নেকির পাল্লা ভারী হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের ভালোবাসবেন এবং আমরা আখিরাতে সফলতা লাভ করব।

কাজ : শিক্ষার্থী-

(ক) আখিরাতের পর্যায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

(খ) বাড়ির কাজ হিসেবে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব সম্পর্কে দশটি বাক্য লিখে শ্রেণীতে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৯

তাওহিদ ও নৈতিকতা

তাওহিদ অর্থ একত্ববাদ। আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয়-এ বিশ্বাসকে তাওহিদ বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝

অর্থ : '(হে নবি!) বলুন, তিনিই আল্লাহ, তিনি এক ও অদ্বিতীয়।' (সুরা আল-ইখলাস, আয়াত ০১)

আর নৈতিকতা হলো নীতিমূলক, নীতি সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ কথাবার্তা, আচার-আচরণে নীতির অনুসরণ করাকেই নৈতিকতা বলা হয়। তাওহিদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। তাওহিদের শিক্ষা মানুষকে নৈতিকতার দিকে পরিচালনা করে। যে ব্যক্তি তাওহিদে বিশ্বাসী,সে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের স্রষ্টা। তিনি আমাদের উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের লালন-পালন করেন। পৃথিবীর সমস্ত নিয়ামত তাঁরই দান। তিনি আমাদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আমাদের সৃষ্টি করার মূল কারণ হলো তাঁর ইবাদত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ○

অর্থ : 'আমি জিন এবং মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।' (সুরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

সুতরাং মানুষের উচিত তাঁর ইবাদত করা, শুকরিয়া আদায় করা। জীবনযাপনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। মানুষের স্বাভাবিক নীতিও এ কথা সমর্থন করে। যেমন- চাকর বা গোলামের দায়িত্ব হলো তার মনিবের আনুগত্য করা। যে লোক এরূপ করে না তাকে বলা হয় অকৃতজ্ঞ। অতএব, তাওহিদে বিশ্বাস আমাদের আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভালো ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহিত করে। এভাবে নৈতিকতা অর্জনে তাওহিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তাওহিদের মূল শিক্ষা হলো আল্লাহ তাআলাকে একক সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করা। পাশাপাশি আল্লাহ তাঁর গুণাবলিতেও একক-এ বিশ্বাসও তাওহিদের অন্তর্গত। তাওহিদ আমাদের আল্লাহ তাআলার নানা গুণের পরিচয় দান করে। যেমন- আল্লাহ তাআলা রাহমান, রাহিম, করিম, গাফফার, রাযযাক, খালিক, মালিক, রব ইত্যাদি। এ সমস্ত গুণের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলা একক। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। তিনি সকল গুণে অতুলনীয়। কোনো মানুষ বা সৃষ্টির পক্ষে তাঁর এসব গুণের পূর্ণ অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। তবে মানুষ নিজ জীবনে এসব গুণের চর্চা করবে। উত্তম চরিত্রবান হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

আল্লাহ তাআলার এসব গুণ নৈতিকতার সর্বোত্তম স্তর। মানুষ যখন এসব গুণাবলি অনুশীলন করে,তখন তার সকল কাজ নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী হয়। তার দ্বারা নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে তাওহিদ মানুষকে আল্লাহ তাআলার গুণাবলি অর্জন করতে উৎসাহিত করে।

অন্যদিকে আল্লাহ তাআলার অন্যতম গুণ হলো শাস্তিদাতা, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছু জানেন, সকল কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি একমাত্র মালিক ও মহাবিচারক। এসব গুণ মানুষকে নীতি ও আদর্শ মেনে চলতে সাহায্য করে। এগুলোতে বিশ্বাস করলে মানুষ কোনো অন্যায় ও দুর্নীতি করতে পারে না। কারণ সে জানে,আল্লাহ তাআলা তার সকল কাজ দেখছেন। তিনি এগুলোর হিসাব নেবেন। অতঃপর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেবেন। এভাবেও তাওহিদের শিক্ষা মানুষকে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

তাওহিদ মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল করে তোলে। তাওহিদে বিশ্বাসীগণ শুধু আল্লাহ তাআলার ইবাদত করেন। আল্লাহ তাআলাকেই ইলাহ বা প্রভু হিসেবে স্বীকার করে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ

অর্থ : 'তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।' (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫)

সুতরাং তাওহিদে বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সৃষ্টির নিকট মাথা নত করে না। কারো আনুগত্য করে না। বরং মানুষ হিসেবে নিজ মর্যাদা রক্ষায় সচেতন থাকে। অপরদিকে অবিশ্বাসীরা সকল কিছুর নিকট ভরসা করে, মাথা নত

করে। এটা মানবিক আদর্শের বিপরীত। ফলে দেখা যায় যে মানুষ তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানবিক গুণ ও মর্যাদা লাভ করে। তাওহিদ মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

আমরা জানতে পারলাম যে তাওহিদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাওহিদ নানাভাবে মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। যুগে যুগে তাওহিদে বিশ্বাসী মানুষগণ ছিলেন নৈতিকতার উত্তম আদর্শ স্বরূপ।

আমরাও তাওহিদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করব। অন্যায়,অত্যাচার ও দুর্নীতি করব না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির অনুশীলন করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর খুশি হবেন। আমাদের জীবন সুন্দর ও শান্তিময় হবে।

কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। এবার প্রত্যেক দল থেকে তিনজন বক্তা নির্বাচন করবে। 'শুধু তাওহিদে অটল বিশ্বাস মানুষকে বলিষ্ঠ ও নৈতিক চরিত্র উপহার দিতে পারে' বিষয়ের পক্ষে একদল এবং বিপক্ষে একদল অবস্থান নিয়ে বিতর্ক করবে। শ্রেণিশিক্ষক সভাপতি ও সঞ্চালক হিসেবে থাকবেন। বিতর্কে পুরস্কারের ব্যবস্থাও রাখা যায়।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ

১. কুফরের কুফল ও পরিণতি .....।
২. ইমানের সর্বপ্রথম বিষয় হলো ..... প্রতি বিশ্বাস।
৩. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসও ..... গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
৪. হায়্যুন শব্দের অর্থ .....।
৫. রিসালাতে বিশ্বাস না করলে ..... হওয়া যায় না।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আকাইদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো	বিপরীত
২. কুফর হলো ইমানের	অপরিসীম
৩. নিশ্চয়ই শিরক চরম	শস্যক্ষেত্র
৪. মানবজীবনে আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের প্রভাব	তাওহিদ
৫. দুনিয়া হলো আখিরাতের	জুলুম

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কুফর অর্থ কী? উদাহরণসহ লেখো।

২. রিসালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখো।

৩. কী কী কাজ করলে কুফর প্রমাণিত হয়। পাঁচটি উদাহরণ দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ইমান মুফাস্সালের বিষয়গুলো বর্ণনা করা।

২. 'কাফিরদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ' – উক্তিটির বিশ্লেষণ কর।

৩. ওহির প্রকারভেদ লিখে ওহি নাযিলের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মহান আল্লাহকে একক সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করাকে কী বলে?

ক. আকাইদ খ. তাকওয়া

গ. তাওহিদ ঘ. আনুগত্য।

২. শিরকের মাধ্যমে মানুষ –

i. আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে

ii. রিসালাতে অবিশ্বাস করে

iii. অন্য সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে।

কোনোটি সঠিক?

ক. i খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ছামি ও সাকিব বন্ধু। ছামি নামায আদায় করে, কিন্তু প্রায়ই সাকিবদের বাসায় যাওয়ার কথা বলে যায় না। সাকিব এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য ছামিকে বোঝানোর চেষ্টা করে।

৩. ছামির এ কাজটি কিসের শামিল?

ক. কুফরির খ. মুনাফিকির

গ. বিদয়াতির গ. শিরকির।

৪. সাকিবের বোঝানোর বিষয়টি হচ্ছে –

i. সামাজিক দায়িত্ব পালন

ii. ইমানি দায়িত্ব পালন

iii. মুত্তাকি হওয়ার বাসনা

কোনোটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সমাজপতি রাজা মিয়ার ভয়ে মানুষ তটস্থ থাকে। তিনি মানুষকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন এবং তিনি যা বলেন তাই করতে বাধ্য করেন। তার প্রকল্পে কর্মরত জনাব ফরিদ উদ্দিনকে নামায পড়তে নিষেধ করে বলেন, নামায আবার কিসের জন্য, কাজ কর তাহলেই সুখ পাবে। কিন্তু ফরিদ উদ্দিন নিয়মিত নামায আদায় করেন এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। অবশেষে কর্তৃপক্ষ ফরিদ উদ্দিনের দায়িত্বশীলতায় খুশি হয় এবং তাকে পদোন্নতি দেয়।

ক. তাওহিদ শব্দের অর্থ কী?

খ. আখিরাত বলতে কী বোঝায়?

গ. নামাযের প্রতি রাজা মিয়ার মনোভাব ইসলামের দৃষ্টিতে কিসের শামিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. যে মূল বিশ্বাসের ফলে ফরিদ উদ্দিন নামাযে দৃঢ় ও দায়িত্বশীল-তা বিশ্লেষণ কর।

২। বিজ্ঞ বিচারক জাকারিয়া সাহেব ন্যায়বিচার করেন। এতে ঘুষ লেনদেনকারী দালাল গোষ্ঠী তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়। এমনকি তাকে বদলি করানোর জন্য লেগে যায়। বিচারক সাহেব এটা জানার পরেও ঠণ্ডা মাথায় ধৈর্যধারণ করেন। আসমাউল হুসনার বিষয়গুলো নিজের জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন এবং আল্লাহর ভয়ে সবসময় ভীত থাকেন। বিচারকের এমন মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে অবশেষে দালাল গোষ্ঠী তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

ক. আসমাউল হুসনার অর্থ কী?

খ. আসমাউল হুসনা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান থাকা আবশ্যক কেন? বুঝিয়ে লেখো।

গ. আল্লাহর যে গুণের ভয়ে বিচারপতি ভীত থাকেন তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'আল্লাহ সাবুরুন' গুণের সাথে বিচারকের সংশ্লিষ্ট গুণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ)

'ইবাদত' আরবি শব্দ। এর অর্থ দাসত্ব, বন্দেগি, আনুগত্য ইত্যাদি। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুলুল্লাহ (স.) প্রদর্শিত পন্থায় জীবন পরিচালিত করাকেই ইবাদত বলে। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ ইত্যাদি আমরা যেমনি ইবাদত হিসেবে পালন করে থাকি, তেমনি জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামি বিধিবিধান মোতাবেক সম্পন্ন করাও ইবাদতের অংশ। আল্লাহ জিন ও মানবসন্তানকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

শিখনফল : এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী –

- জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- ইমাম ও মুক্তাদির দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার সালাতের পরিচয় – মাসবুকের সালাত, মুসাফিরের সালাত, অসুস্থ ব্যক্তির সালাত, জুমার সালাত, ঈদের সালাত, জানাযার সালাত, তারাবিহের সালাত, তাহাজ্জুদের সালাত, ইশরাকের সালাত সম্পর্কে বলতে পারবেও যথাযথভাবে আদায় করবে।
- সালাতের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সাওমের ধারণা, প্রকারভেদ এবং সাওম ভঙ্গের কারণ, সাওম মাকরুহ হওয়ার কারণ, সাওমের কাযা ও কাফ্ফারা সম্পর্কে বলতে পারবে।
- সাহ্‌রি ও ইফতারের পরিচয়, সময়সূচি ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
- ইতিকাফ, সাদাকাতুল ফিতরের ধারণা, তাৎপর্য ও আদায়ের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সাওমের নৈতিক উপকার সম্পর্কে বলতে পারবে। বাস্তব জীবনে সংযম, সহমর্মিতা ও সহিষ্ণুতা অনুশীলনে সাওমের (রোযার) গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।

পাঠ ১

সালাত (اَلصَّلٰوةُ)

ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সালাত বা নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে সালাত। সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে।

জামাআতে সালাত

জামাআত আরবি শব্দ। এর অর্থ একত্রিত হওয়া, সমবেত হওয়া প্রভৃতি। ইসলামি পরিভাষায়, নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট

জায়গায় মুসলিম সম্প্রদায় ইমামের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করাকে জামাআতে সালাত আদায় বলে।

জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব

ফরয সালাত একাকী আদায় করার চেয়ে জামাআতে আদায় করার প্রতি বিশেষ তাগিদ রয়েছে। আল্লাহ্তাআলা বলেন:

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ○

অর্থ : 'তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।' (বাকারা : ৪৩)

নবি করিম (স.) জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন: 'একাকী সালাত আদায় অপেক্ষা জামাআতে আদায় করলে সাতাশগুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।' (বুখারি ও মুসলিম)। জামাআতে সালাত আদায়কারীকে নবি করিম (স.) খুবই পছন্দ করতেন। তিনি নিজে কখনও জামাআত ত্যাগ করেননি। আবার কেউ জামাআতে উপস্থিত না হলে তিনি খোঁজ নিতেন এবং এতে মহানবি (স.) অসন্তুষ্ট হতেন। তাই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন ও অধিক সাওয়াব পাওয়ার আশায় প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে জামাআতে সালাত আদায় করতে হবে।

ইমাম

ইমাম অর্থ নেতা। যিনি সালাত পরিচালনা করেন, তিনিই ইমাম। অন্য কথায়, জামাআতে সালাত আদায়ের সময় মুসল্লিগণ (মুক্তাদি) যাকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করে, তাকে ইমাম বলে। যার কিরাআত শুদ্ধ, সুন্দর ও ইসলামি জ্ঞান বেশি এবং বয়সে বড় তিনিই ইমাম হওয়ার যোগ্য। তাই একজন যোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নির্বাচন করা উচিত।

ইমামের কর্তব্য

ইমামের কর্তব্য হচ্ছে সালাতে কাতার সোজা হলো কি না সেদিকে দৃষ্টি রাখা। মুসল্লিদের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা করা। সৎ উপদেশ দেওয়া এবং মুসল্লিদের প্রতি দায়িত্ব যথাযথ পালন করা। ইমাম হিংসা, বিদ্বেষ, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ইসলাম বহির্ভূত কাজকর্ম থেকে দূরে থাকবেন। তাঁর উচিত মুসল্লিদের অবস্থা দেখে সালাতে তিলাওয়াত দীর্ঘ বা ছোট করা। মুসল্লিদের মধ্যে অনেকে বৃদ্ধ, রুগ্ন, দুর্বল ও মুসাফির থাকতে পারে, তাই ইমামকে সকলের প্রতি লক্ষ রেখে সালাত আদায় করতে হবে। জামাআতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষকে শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা ও নেতার প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দেয়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে এবং সামাজিক ঐক্যের প্রতিফলন ঘটায়।

মুক্তাদি

ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে অনুসরণপূর্বক যারা সালাত আদায় করে, তাঁদের মুক্তাদি বলা হয়। মুক্তাদি এই বলে সালাতের নিয়ত করবে যে 'আমি এই ইমামের পেছনে সালাত আদায় করছি।' সালাতের যাবতীয় কাজে মুক্তাদিকে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। যদি মুক্তাদি একজন হয় তবে ইমামের ডান দিকে কিছুটা পিছনে দাঁড়াবে। যদি ইমাম তিলাওয়াতে ভুল করেন, তাহলে নিকটবর্তী মুক্তাদি সংশোধন করে দিবে। আর যদি অন্য কোনো কাজে ভুল করেন, যেমন: দাঁড়ানোর পরিবর্তে বসে, বসার পরিবর্তে দাঁড়ায়, তবে 'সুবহানাল্লাহ্' বলে ইমামকে সংশোধন করে দিবে। (বুখারি)

সালাত শেষে মুসল্লিগণ একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করবে। নিয়মিত কোনো মুসল্লি অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ

খবর নিবে। নিয়মিতভাবে উক্ত অভ্যাস চর্চা করলে গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে। নেতার ভুল হলে বিরোধিতা না করে সংশোধনের জন্য সহযোগিতা করবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে ইমাম ও মুক্তাদির কর্তব্যগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টার পেপারে মার্কার দিয়ে লিখবে।

পাঠ ২

বিভিন্ন প্রকার সালাত

মাসবুকের সালাত (صَلٰوةُالْمَسْبُوْقِ)

যে ব্যক্তি নামাযে এক বা একাধিক রাকআত শেষ হওয়ার পর ইমামের সাথে জামাআতে অংশগ্রহণ করে, তাকে মাসবুক বলে।

মাসবুকের সালাত আদায়ের নিয়ম

মুসল্লি জামাআতে সালাত আদায় করতে গিয়ে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থাতেই নিয়ত করে নামাযে অংশগ্রহণ করবে। তারপর ইমামের সাথে যথারীতি রুকু সিজদা করে তাশাহহুদ পাঠের জন্য বসে যাবে। ইমাম সালাম ফিরালে সে মুসল্লি সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো রুকু, সিজদা করে যথারীতি তাশাহহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করবে। রুকুসহ ইমামের সাথে যে কয় রাকআত পাওয়া যায় তা আদায় হয়ে যায়। রুকুর পর ইমামের পিছনে ইক্তেদা বা নামাযে দাঁড়ালে ঐ রাকআত মাসবুককে আদায় করতে হবে।

মুক্তাদির সালাত এক, দুই, তিন, চার রাকআত ছুটে গেলে, তা আদায়ে কিছুটা তারতম্য রয়েছে।

নিম্নে এসবের বর্ণনা করা হলো :

মুক্তাদি ইমামের পিছনে ইক্তেদা করার পর যদি এক রাকআত ছুটে যায়, তবে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া এক রাকআত একাকী সালাত আদায়ের ন্যায় আদায় করে নিবে।

দুই রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া দুই রাকআত যথা নিয়মে আদায় করবে, যেভাবে ফজরের দুই রাকআত ফরয সালাত একাকী আদায় করা হয়।

তিন রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। এক রাকআত যথানিয়মে আদায় করে প্রথম বৈঠক করবে। এ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর আবার দাঁড়িয়ে যাবে এবং বাকি দুই রাকআত যথানিয়মে আদায় করে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।

চার, তিন, দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদি ইমামকে শেষ বৈঠকে পেলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। যথানিয়মে ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো এমনভাবে আদায় করে নিবে, যেভাবে একজন মুসল্লি একাকী চার, তিন, দুই

রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায় করে থাকে।

কাজ: কোনো এক শিক্ষার্থী মাগরিবের নামায আদায় করতে মসজিদে গিয়ে ইমামের সাথে এক রাকআত পেয়েছে। অবশিষ্ট নামায কীভাবে আদায় করবে? শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

মুসাফিরের সালাত (صَلٰوةُ الْمُسَافِرِ)

'মুসাফির' আরবি শব্দ। এর অর্থ ভ্রমণকারী। কমপক্ষে ৪৮ মাইল দূরবর্তী কোনো স্থানে যাওয়ার নিয়তে কোনো ব্যক্তি বাড়ি থেকে বের হলে শরিয়তের পরিভাষায় তাকে মুসাফির বলে। এমন ব্যক্তি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কমপক্ষে পনের দিন অবস্থানের নিয়ত না করা পর্যন্ত তার জন্য মুসাফিরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। শরিয়তে মুসাফিরকে সংক্ষিপ্ত আকারে সালাত আদায়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই সংক্ষিপ্তকরণকে আরবিতে কস্‌র বলা হয়। মুসাফির অবস্থায় যুহর, আসর ও ইশার ফরয সালাত কসর পড়তে হয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ

অর্থ : 'যখন তোমরা দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই।'

(সুরা আন-নিসা, আয়াত ১০১)

মুসাফিরের জন্য কসর সালাত আদায় করার অনুমতি আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন: 'এটি একটি সাদাকা, যা আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের (মুসাফিরদের) দান করেছেন। এ সাদাকা তোমরা গ্রহণ কর।' (বুখারি ও মুসলিম)

মুসাফিরের সালাত আদায়ের নিয়ম

চার রাকআতবিশিষ্ট অর্থাৎ যুহর, আসর, ও ইশার ফরয সালাত মুসাফির ব্যক্তি দুই রাকআত করে আদায় করবে। ফজর, মাগরিব ও বিতরের নামাযে কসর নেই। এগুলো পুরোপুরি আদায় করতে হবে।

আল্লাহর দেওয়া সকল সুযোগ-সুবিধা খুশি মনে গ্রহণ করা উচিত। কাজেই কোনো মুসাফির ব্যক্তি যদি ইচ্ছে করে যুহর, আসর বা ইশার ফরয সালাত চার রাকআত আদায় করে, তবে আল্লাহর দেওয়া সুযোগ গ্রহণ না করায় গুনাহগার হবে। কিন্তু ইমাম যদি মুকিম (স্থায়ী) হয়, তা হলে সে ইমামের অনুসরণ করে পূর্ণ সালাত আদায় করবে। সফর একটি কষ্টকর বিষয়। তাই আল্লাহ্ তাঁর বান্দার ওপর সালাত সংক্ষিপ্ত করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

কাজ : মুসাফির অবস্থায় কোন কোন নামায পূর্ণ এবং কোন কোন নামায কসর পড়তে হয়, তার একটি তালিকা পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

রুগ্‌ণ ব্যক্তির সালাত (صَلٰوةُ الْمَرِيْضِ)

রোগী বা অক্ষম ব্যক্তি যথানিয়মে সালাত আদায় করতে না পারলে, তার জন্য ইসলামে সহজ নিয়মের অনুমোদন রয়েছে। রোগীর সেই সহজ নিয়মে সালাত আদায়কে রুগ্‌ণ ব্যক্তির সালাত বলে।

রুগ্‌ণ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়ম

রুগ্‌ণ ব্যক্তিকে হুঁশ থাকা পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই সালাত আদায় করতে হবে। রোগ যত কঠিন হোক না কেন, সম্পূর্ণরূপে অপারগ না হলে সালাত ত্যাগ করা যাবে না। রোগীর দাঁড়াতে কষ্ট হলে বসে রুকু-সিজদার সাথে সালাত আদায় করবে। রুকু-সিজদা করতে অক্ষম হলে বসে ইশারায় সালাত আদায় করবে। ইশারা করার সময় রুকু অপেক্ষা সিজদায় মাথা একটু বেশি নত করতে হবে। মাথা দিয়ে ইশারা করতে হবে, চোখে ইশারা করলে সালাত আদায় হবে না। রুগ্‌ণ ব্যক্তিকে বসার সময় সালাতের অবস্থায় বসতে হবে। যদি রোগী এতোই দুর্বল হয় যে বসে থাকা সম্ভব নয়, তবে কিবলার দিকে পা দুটি রাখতে হবে। পা সোজা না রেখে হাঁটু উঁচু করে রাখতে হবে এবং মাথার নিচে বালিশ বা এ জাতীয় কিছু জিনিস রেখে মাথা একটু উঁচু রাখতে হবে। শুয়ে ইশারায় রুকু ও সিজদা করবে অথবা উত্তর দিকে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে এবং কিবলার দিকে মুখ রেখে ইশারায় সালাত আদায় করবে। যদি এভাবেও সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে তার ওপর সালাত আর ফরয থাকে না, মাপ হয়ে যায়। অপারগ অবস্থায় বা কেউ বেহুঁশ হয়ে পড়লে যদি চব্বিশ ঘন্টা সময় অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বা তার চেয়ে কম সময় অতিক্রান্ত হয়, তাহলে সক্ষম হওয়ার পর রুগ্‌ণ ব্যক্তিকে কাযা করতে হবে। যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশি সময় অতিবাহিত হয়, তবে আর কাযা করতে হবে না। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে সালাত এমন একটি ইবাদত, যা সক্ষমতার শেষ সীমা পর্যন্ত আদায়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে। কোনোভাবেই সালাত ত্যাগ করা যায় না।

কাজ : রুগ্‌ণ ব্যক্তির নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

জুমার সালাত (صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ)

সালাত এবং জুমুআ দু টিই আরবি শব্দ। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় জুমার সালাত। শুক্রবার যুহরের সময়ে যুহরের সালাতের পরিবর্তে যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে বলা হয় জুমার সালাত। প্রতি শুক্রবার জামে মসজিদে জুমার সালাত জামাআতে আদায় করা হয়।

গুরুত্ব

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ন্যায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, মুসলিম পুরুষের ওপর জুমার সালাত আদায় করা ফরয। আর এর অস্বীকারকারী কাফির। অবহেলা করে কেউ এ সালাত আদায় না করলে সে ফাসিক হয়ে যাবে। জুমার সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থ : 'হে মুমিনগণ। জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।' (সূরা জুমুআ, আয়াত ৯)।

জুমার দিন সপ্তাহের উত্তম দিন। এদিনে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। এদিনে তাঁর তাওবা কবুল হয়। এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এ দিন দোয়া কবুলের উত্তম দিন। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন: 'যে ব্যক্তি শুক্রবারে গোসল করে যথাসম্ভব পবিত্র হয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে জুমার সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যায়, মসজিদে গিয়ে কাউকে কষ্ট না দিয়ে যেখানে জায়গা পায় সেখানেই বসে যায়, যথাসম্ভব সালাত আদায় করে এবং নীরবে বসে মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনে। আল্লাহ তাআলা তার বিগত জুমা হতে এ জুমা পর্যন্ত সকল (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন।' (বুখারি)

জুমার সালাত আদায় না করলে ইসলামে কঠের শাস্তির বিধান রয়েছে। যেমন: মহানবি (স.) বলেন: 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পর পর তিন জুমা ত্যাগ করে, তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয় এবং তার দিলকে মুনাফিকের অন্তরে পরিণত করে দেওয়া হয়।' (তিরমিযি)

জুমার সালাত আদায়ের নিয়ম

প্রথমে মসজিদে গিয়ে তাহিয়্যাতুল ওযু ও দুখুলুল মসজিদ দুই দুই রাকআত করে নফল সালাত আদায় করতে হয়। ফরযের আগে চার রাকআত কাবলাল জুমা ও পরে চার রাকআত বা'দাল জুমা আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

জুমার সালাতের জন্য দুটি আযান দেওয়া হয়। প্রথম আযান মসজিদের বাইরে মিনারে, দ্বিতীয়টি মসজিদের ভেতরে ইমাম সাহেব খুতবা দিতে মিম্বরে বসলে দেওয়া হয়। জুমার দুই রাকআত ফরযের পূর্বে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের উদ্দেশে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেন। মুসল্লিদের খুতবা শোনা ওয়াজিব। এ সময় কথা বলা, অনর্থক কিছু করা নিষেধ। খুতবা শেষে ইমামের সাথে দুই রাকআত ফরয সালাত অন্যান্য ফরয সালাতের ন্যায় আদায় করতে হয়। জুমার ফরযের জন্য জামাআত শর্ত রয়েছে। জামাআত ছাড়া জুমা সালাত হয় না। কোনো কারণে জুমাতে অংশগ্রহণ করতে না পারলে যুহরের সালাত আদায় করতে হয়। কাজেই জুমার সালাত যুহরের সময়েই পড়তে হবে।

সামাজিক শিক্ষা

জুমার সালাতে এলাকার লোকজন একত্রিত হয়। পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ হয় এবং কুশলাদি বিনিময়ের সুযোগ হয়। সুখে-দুঃখে একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা করার সুযোগ হয়। ইমামের পিছনে সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসল্লিগণ সালাত আদায় করে থাকে। ফলে সকলের মধ্যে সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও ভাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। মুসলিম ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়। সপ্তাহে একবার মিলিত হওয়া ও নেতার আদেশ-নিষেধ শুনে, তা মেনে চলার এক অনুপম আদর্শ প্রকাশিত হয় জুমার সালাতে। গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, যথাসম্ভব পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা ও প্রথম কাতারে বসার মানসিকতা বৃদ্ধি পায়। মন প্রফুল্ল থাকে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে জুমার নামায সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতটির অর্থ পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩

ঈদের সালাত

ঈদ আরবি শব্দ।এর অর্থ আনন্দ, উৎসব ইত্যাদি। ঈদের দিন হলো মুসলমানদের মহামিলন ও জাতীয় খুশির দিন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেছেন: 'প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন আছে। আর আমাদের উৎসব হলো ঈদ।' (বুখারি ও মুসলিম)

বছরে দুটি ঈদ। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। ঈদের দিন সারা এলাকার মুসল্লিগণ একত্রে ঈদগাহে যান এবং দুই রাকআত ঈদের সালাত আদায় করে আল্লাহর শুকরিয়া জানান।

ঈদুল ফিতর (عِيْدُالْفِطْرِ)

ঈদ মানে আনন্দ। আর ফিতর অর্থ সাওম বা রোযা ভঙ্গ করা। ঈদুল ফিতর অর্থ সাওম ভঙ্গের আনন্দ। সুদীর্ঘ একটি মাস আল্লাহর নির্দেশ মতো রোযা পালনের পর বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় এদিনে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আনন্দ-উৎসব করে বলে একে ঈদুল ফিতর বলা হয়। রমযানের পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন মুসলমানগণ এ উৎসব পালন করে। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের ওপর রমযান মাসে যে ইবাদত নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন,তা পালন করার তাওফিক দান করায় মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে এদিন শুকরিয়া জানান এবং দুই রাকআত ঈদুল ফিতরের ওয়াজিব সালাত আদায় করেন।

গুরুত্ব

ঈদের দিন আত্মীয়স্বজন,পাড়া-প্রতিবেশী সকলের খোঁজখবর নিতে হয়। সাধ্যমতো তাদের বাসায় মিষ্টান্ন খাদ্য যেমন: পিঠা,পায়েস, সেমাই ইত্যাদি খাবার পাতে হয়। ধনী, গরিব, মিসকিন সকলের সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে হয়। এতে সকলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ঈদ আসে আনন্দের বার্তা নিয়ে, আসে সীমাহীন প্রীতি, ভালোবাসা ও কল্যাণের সংবাদ নিয়ে। সেই ঈদকে যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা মুসলমানদের অবশ্যকর্তব্য।

ঈদুল ফিতরের দিন দুটি কাজ ওয়াজিব: ১. ফিতরা দেওয়া ২. ঈদের দুই রাকআত সালাত ছয় তাকবিরের সাথে আদায় করা।

ঈদের দিনে সুন্নাত কাজ

১. গোসল করা।

২. সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৩. পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা।

৪. সালাত আদায়ের পূর্বে মিষ্টিজাতীয় খাদ্য খাওয়া।

৫. ময়দানে গিয়ে ঈদের সালাত আদায় করা।

৬. ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবির বলতে বলতে যাওয়া।

৭. এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা।

ঈদের তাকবির

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ

ঈদের সামাজিক শিক্ষা : বছরে দু'দিন মহান আল্লাহ্ মানুষের জন্য মহাসম্মেলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তারা হিংসা–বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ইত্যাদি ভুলে গিয়ে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। রমযানের রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষের তৃষ্ণা-ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে গরিবদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। সর্বোপরি গড়তে পারে একটি শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ঈদুল ফিতর দিনের ওয়াজিব ও সুন্নাত কাজগুলোর চার্ট তৈরি করে পোস্টার পেপারে লিখবে।

ঈদুল আযহা (عِيْدُ الْأَضْحٰى)

'ঈদুল আযহা' শব্দদ্বয় আরবি। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় কুরবানির ঈদ। বিশ্ব মুসলিম জাতি ত্যাগের নিদর্শন স্বরূপ মহাসমারোহে পশু যবেহ করার মাধ্যমে যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখ যে উৎসব পালন করে থাকে, তাকে ঈদুল আযহা বলে। আল্লাহর নবি হযরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর ইঙ্গিতে তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। পুত্র ইসমাঈল (আ.)ও এটাই আল্লাহর ইচ্ছা জানতে পেরে আনন্দিত চিত্তে তা গ্রহণ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ইসমাঈলের পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানি হলো। এ স্মৃতি রক্ষার্থে মুসলমানগণ প্রতিবছর কুরবানি করে থাকেন। কুরবানির অতুলনীয় ইতিহাস স্মরণ করে মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে এ দিন শপথ করে বলেন, হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির জন্য যেভাবে আমরা পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, তেমনিভাবে আমরা তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করতেও সদা প্রস্তুত আছি।

গুরুত্ব

আর্থিক সংগতিসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমানকে কুরবানি করতে হয়।এটা আল্লাহর বিধান। শুধু গোশত বা রক্তের নাম কুরবানি নয় বরং আল্লাহর নামে সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার এক আন্তরিক শপথের নাম কুরবানি। কুরবানির মাধ্যমে মুসলমানের ইমান ও তাকওয়ার পরীক্ষা হয়ে থাকে। আর এই তাকওয়াই হচ্ছে কুরবানির প্রাণশক্তি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط

অর্থ: 'আল্লাহর নিকট সেগুলোর (কুরবানির পশুর) গোশত এবং রক্ত পৌঁছায় না বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।' (সুরা-হাজ্জ আয়াত ৩৭)

কুরবানির গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন: 'কুরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা কবুল হয়ে যায়।' (তিরমিযি)। তিনি আরও বলেন, 'কুরবানির পশুর প্রত্যেকটি পশমের জন্য একটি করে সাওয়াব পাওয়া যায়।' (ইবনে মাজাহ)। সামর্থ্যবান ব্যক্তি কুরবানি না করলে রাসুলুল্লাহ (স.) অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, 'যে ব্যক্তির সমর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানি না করে, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে' (আবু দাউদ)। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও অশেষ পুণ্য পাওয়ার আশায় খুশি মনে কুরবানি করতে হবে।

কুরবানির গোশত বিতরণে মুস্তাহাব বিধান

কুরবানির গোশত তিন ভাগে ভাগ করে একভাগ নিজের জন্য রেখে একভাগ আত্মীয় ও প্রতিবেশীকে একভাগ গরিব মিসকিনকে দিতে হয়। এতে ধনীদের সাথে গরিবরাও ঈদের আনন্দে অংশীদার হওয়ার সুযোগ পায়।

ঈদুল আযহার ওয়াজিব কাজ: ১. অতিরিক্ত ছয় তাকবিরের সাথে ঈদুল আযহার দুই রাকআত সালাত আদায় করা।

২. কুরবানি করা। এ ছাড়া যিলহজ মাসের ৯ তারিখ ফজর হইতে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয সালাতের পর তাকবিরে তাশরিক একবার বলা ওয়াজিব। জামাআতে সালাত আদায় করলে সবাই উচ্চস্বরে পড়বে আর একাকী সালাত আদায় করলে নীরবে পড়বে।

ঈদুল আযহার সুন্নাত ঈদুল ফিতরের মতো। কেবল পার্থক্য এই যে ঈদুল ফিতরের দিন সালাতের আগে আর ঈদুল আযহার দিন সালাত ও কুরবানির পর কিছু খাওয়া সুন্নাত।

ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম

ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করা যায়। প্রথমে কাতার করে নিয়ত করবে। তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধবে। সানা পড়বে। তারপর ইমাম সাহেবের সাথে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবে। প্রত্যেক তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠবে। প্রথম দুই তাকবিরে হাত বাঁধবে না। তৃতীয় তাকবিরে অন্যান্য সালাতের ন্যায় হাত বাঁধবে। ইমাম সাহেব স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম রাকআত শেষ করে দ্বিতীয় রাকআতের রুকুতে যাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবেন। মুসল্লিরাও তাঁর সাথে তাকবির বলবে। তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেবে, হাত বাঁধবে না। চতুর্থ তাকবিরে রুকুতে যাবে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে সালাত শেষ করবে। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুটি খুতবা দেবেন। প্রত্যেক মুসল্লির খুতবা শোনা ওয়াজিব। ঈদের মাঠে যাবার পথে ঈদুল আযহার তাকবির ঈদুল ফিতরের তাকবিরের অনুরূপ। আর ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি একই শুধু নিয়তের বেলায় আলাদা নিয়ত করতে হবে।

সামাজিক শিক্ষা

ঈদের দিনে আমরা ভেদাভেদ ভুলে যাব। বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করব। একে অন্যের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিব, পরস্পরের সাথে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলব। একে অপর থেকে ভালোবাসার শিক্ষা গ্রহণ করব। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতায় আমাদের জীবনকে সুন্দর করে গঠন করার শিক্ষা গ্রহণ করব। সামাজিক সাম্যের শিক্ষা গ্রহণ করব।

কাজ : ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত সমবেত ক্লাসে একজন শিক্ষার্থী আদায় করে দেখাবে, অন্যরা ভুলগুলো তাদের নিজ নিজ খাতায় লিখবে। পরে আলোচনা করবে।

পাঠ ৪

সালাতুল জানাযা (صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ)

পরিচয়

'সালাতুল জানাযা' দুটিই আরবি শব্দ। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় জানাযার সালাত বা জানাযার নামায। মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কবরস্থ করার পূর্বে চার তাকবিরসহ যে সালাত আদায় করা হয়,তাকে জানাযার সালাত বলে। জানাযার সালাত ফরযে কিফায়া। এলাকার কিছুসংখ্যক লোক এ সালাত আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে সালাত আদায় হয়ে যায়। কেউ আদায় না করলে এলাকার সবাই গুনাহগার হবে। এ সালাতে রুকু-সিজদা নেই।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানুষ মরণশীল। প্রত্যেকেই একদিন না একদিন মরতে হবে। মৃত ব্যক্তির প্রতি জীবিতদের অনেক কর্তব্য আছে। মৃতকে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো, তার ওপর জানাযার সালাত আদায় করা এবং সবশেষে তাকে কবরস্থ করা একান্ত কর্তব্য। মূলত জানাযার সালাত হলো মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া। যত বেশি লোক একত্রিত হয়ে দোয়া করবে ততই তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই জানাযার সালাতে লোক সংখ্যা যত বেশি হবে, ততই ভালো, কিন্তু লোকসংখ্যা বেশি জমার জন্য জানাযা বিলম্ব করা ঠিক নয়। অধিক লোক একত্রিত করার জন্য মৃত্যুর সংবাদ চারদিকে প্রচার করা উচিত। আল্লাহর নিকট একদিন আমাদেরও ফিরে যেতে হবে, এ সালাত সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন: 'যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে, তার জন্য এক কিরাত (সাওয়াব) এবং যে ব্যক্তি দাফনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে, তার জন্য দুই কিরাত (সাওয়াব)। এক একটি কিরাত হলো উহুদ পাহাড় পরিমাণ।' (তিরমিযি)

জানাযার সালাত আদায়ের নিয়ম

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করিয়ে কাফন পরানোর পর ইমাম তাকে সামনে রেখে তার বুক বরাবর দাঁড়াবেন। মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। তারপর মনে মনে নিয়ত করবে, 'আমি কিবলামুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে চার তাকবিরের সাথে জানাযার সালাত ফরযে কিফায়া আদায় করছি।'

প্রথম তাকবির বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হাত বাঁধবে। পরে সানা পড়ে হাত বাঁধা অবস্থাতেই ইমামের সাথে দ্বিতীয় তাকবির বলবে। তারপর দরুদ শরিফ পড়ে ইমামের সাথে তৃতীয় তাকবির বলবে। তারপর নিম্নের দোয়াটি পড়বে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا – اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ – وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ –

উচ্চারণ: আল্লাহু ম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহয়িয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলামি ওয়ামান তাওয়াফ্ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ ফাহু আলাল ইমান।

এই দোয়া পড়ে চতুর্থ তাকবির বলে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে। তাকবির বলার সময় হাত উঠবে না। মৃত ব্যক্তি যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক হয়, তবে তৃতীয় তাকবিরের পর নিম্নের দোয়াটি পড়বে

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারাতাঁও ওয়াজ আলহু লানা আজরাও ওয়া জুখরাও ওয়াজ আলহু লানা শাফিআও ওয়া মুশাফ্ ফাআন।

মাইয়্যেত অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা হলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজআলহা লানা ফারতাঁও ওয়াজ আলহা লানা আজরাও ওয়াজুখরাও ওয়াজআলহু লানা মুশাফিআতাও ওয়া মুশাফ্ফাআহ।

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় পড়বে:

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

উচ্চারণ: বিসিমিল্লাহি ওয়াআলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ।

কবরের ওপর মাটি দেওয়ার সময় পড়বে:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

উচ্চারণ: মিনহা খালাকনাকুম ওয়াফিহা নুয়িদুকুম ওয়ামিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।

জানাযায় উপস্থিত হওয়া এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের অন্যতম কর্তব্য। ভোগবিলাসে মত্ত উঁচু শ্রেণির মানুষ এবং সহায় সম্বলহীন দরিদ্র মানুষ একই ভাবে সাদা কাপড়ে,খালি হাতে পরপারের যাত্রী হতে হবে।এ সালাত সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষণিকের জীবন অনাড়ম্বরভাবে কাটিয়ে ইমানসহ কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া সবার একান্ত কর্তব্য।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে জানাযার সালাতের গুরুত্ব নিয়ে শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

পাঠ ৫

সালাতুত তারাবিহ (صَلٰوةُ التَّرَاوِيْحِ)

রমযান মাসে ইশার সালাতের পর বিতরের পূর্বে যে সালাত আদায় করতে হয়,তাকে সালাতুত তারাবিহ বা তারাবিহের সালাত বলে। এ সালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। নবি করিম (স.) নিজে এ সালাত আদায় করেছেন ও সাহাবিগণকে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। সুন্নাত সালাত জামাআতে আদায়ের বিধান নেই। তবে তারাবিহের সালাত জামাআতে আদায় করা সুন্নাত। এ সালাত মোট বিশ রাকআত।

তারাবিহর সালাত আদায়ের নিয়ম

রমযান মাসে ইশার ফরয ও দুই রাকআত সুন্নাতের পর বিতরের পূর্বে তারাবিহের নিয়তে দুই রাকআত করে মোট বিশ রাকআত সালাত আদায় করতে হয়। প্রতি চার রাকআত অন্তর বসে বিশ্রাম নিতে হয়। তখন বিভিন্ন তাসবিহ পড়া যায়। নিম্নের দোয়াটিও পড়া যায়-

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْجَبَرُوْتِ - سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا - سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ -

উচ্চারণ: সুবহানাযিল মুলকি ওয়াল মালাকুতে সুবহানাযিল ইযযাতে ওয়াল আজমাতে ওয়াল হায়বাতে ওয়াল কুদরাতে ওয়াল কিবরিয়ায়ে ওয়ালজারারুতে। সুবহানা যিল মালিকিল হাইয়্যেল্লাযিনা লাইয়ানামু ওয়ালইয়ামুতু আবাদান আবাদান সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বানা ওয়ারাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ্।

তারাবিহের সালাত শেষ করে বিতরের সালাত রমযান মাসে জামাআতে আদায় করার বিধান রয়েছে।

তারাবিহের সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত

পবিত্র রমযান মাস রহমতের মাস, বরকতের মাস। পাপ থেকে মুক্তি পাবার শ্রেষ্ঠ সময় হলো রমযান মাস।সারা দিন সাওম (রোযা) পালনের পর বান্দা যখন ক্লান্ত শরীরে তারাবিহের বিশ রাকআত সালাত আদায় করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে, তখন আল্লাহ সে বান্দার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন। বান্দার জন্য এমন সুযোগ বছরে মাত্র একবারই আসে। তাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর রহমত পেতে ব্রতী হন। এ প্রসঙ্গে নবি করিম (স.) বলেন: 'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে আখিরাতে প্রতিদানের আশায় রমযানের রাতে তারাবিহের সালাত আদায় করবে,আল্লাহ তাআলা তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।' (বুখারি)। তারাবিহের সালাত ছোট ছোট সুরার মাধ্যমে আদায় করা যায়। আবার কুরআন খতমের মাধ্যমেও আদায় করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে সুরাগুলো স্পষ্ট ধীরস্থির ও ছন্দের সাথে পড়তে হবে। রমযান মাসে তারাবিহের সালাত একত্রিত হয়ে জামাআতে আদায় করা উত্তম। এতে নামাযে ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। পূর্ণ একটি মাস পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও মত বিনিময়ের ফলে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, মমত্ববোধ, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ গড়ে ওঠে।

কাজ : 'তারাবিহের নামায জামাআতে আদায় করলে ভুল কম হয়।' এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

সালাতুল তাহাজ্জুদ (صَلٰوةُ التَّهَجُّدِ)

'তাহাজ্জুদ' আরবি শব্দ। এর অর্থ রাত জাগা, ঘুম থেকে ওঠ। মধ্যরাতের পর ঘুম থেকে ওঠে যে সালাত আদায় করতে হয়,তাকে তাহাজ্জুদের সালাত বলে। তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা সুন্নাত। এর গুরুত্ব অপরিসীম। নবি করিম (স.) প্রতিনিয়ত এ সালাত আদায় করতেন এবং সাহাবিগণকেও আদায়ের জন্য উৎসাহিত করতেন। মহানবি (স.)-এর ওপর তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের বিশেষ তাগিদ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ

অর্থ : 'রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করুন। এ সালাত আপনার জন্য অতিরিক্ত।' (বনি ইসরাইল, আয়াত ৭৯)

কোনো কারণে তাহাজ্জুদের সালাত ছুটে গেলে মহানবি (স.) দুপুরের আগেই কাযা করে নিতেন।

গুরুত্ব

গভীর রাতে আরামের ঘুম ত্যাগ করে বান্দা যখন আল্লাহর নৈকট্য ও রহমত পাবার আশায় তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে,তখন আল্লাহ খুবই খুশি হন। তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে বান্দার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। এ সালাত আদায়ে পুণ্যময় জীবনের পথ প্রশস্ত হয়। আল্লাহ তাআলা এ সালাত আদায়কারীর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন

'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাঁদের প্রতিপালককে আশায় ও ভয়ে ভয়ে ডাকে এবং তাঁদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাঁদের জন্যে নয়নপ্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাঁদের কৃতকার্যের পুরস্কার স্বরূপ।' (সুরা সাজদা: ১৬, ১৭)। এর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন: 'ফরয সালাতের পর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো তাহাজ্জুদের সালাত।' (মুসলিম)

প্রত্যেক মুমিনের উচিত তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হওয়া। তাহলেই আল্লাহ তার বান্দার ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন।

তাহাজ্জুদের সময় ও আদায়ের নিয়ম

রাতের শেষার্ধে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা উত্তম। এ সালাত আট রাকআত পড়া সুন্নাত। তবে ইশার পর কমপক্ষে দুই রাকআত পড়লেও চলবে।

এ সালাত দুই রাকআত করে আদায় করতে হয়। সুন্নাত সালাতের নিয়মেই আদায় করতে হয়। তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে কয়েকবার দরুদপাঠ করা ভালো। এরপর বিতরের সালাত আদায় করা উত্তম।

কাজ : 'তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।' এ নিয়ে শিক্ষার্থী দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্কের আয়োজন করবে।

পাঠ ৬

সালাতুল ইশরাক (صَلٰوةُ الْاِشْرَاقِ)

ইশরাকের সালাত সুন্নাতে যায়িদা বা নফল। এ নামাযে রয়েছে অনেক ফযিলত। হাদিস শরিফে এর ফযিলত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। ইশরাকের সালাত দুই রাকআত করে ৪, ৬, ৮ রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়। ইশরাকের সালাতকে হাদিসে যুহার সালাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সময়

ইশরাকের সালাত ফজরের পরে আদায় করতে হয়। ফজরের সালাত আদায় করে বিছানাতে বসে কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ, তাহলিল ও দরুদ পাঠরত অবস্থায় থাকা এবং এ সময়ে কথাবার্তা বা কাজকর্ম না করাই উত্তম। সূর্য সম্পূর্ণরূপে উঠে গেলে এ সালাত আদায় করতে হয়। যদি কেউ ফজরের সালাতের পর দুনিয়ার কোনো আবশ্যকীয় কাজকর্ম করে এ সালাত আদায় করে,তবে তাও আদায় হবে। তবে সাওয়াব কম হবে।

আমরা আল্লাহর নৈকট্য ও অধিক পুণ্য লাভের আশায় এ সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হব।

সালাতুল আওয়াবিন (صَلٰوةُ الْاَوَّابِيْنَ)

এ সালাতও সুন্নাতে যায়িদা। হাদিসে আওয়াবিন সালাতের অনেক ফযিলত বর্ণিত আছে। এ সালাত নিয়মিত আদায় করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়।

সময় ও আদায়ের নিয়ম

আওয়াবিনের সালাত মাগরিবের ফরয ও দুই রাকআত সুন্নাতের পর থেকে ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়। আওয়াবিনের সালাত দুই রাকআত করে ছয় রাকআত পড়তে হয়। আমরা অধিক সাওয়াবের আশায় এ সুন্নাত সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ইশরাক ও আওয়াবিন সালাতের সময় ও রাকআত সংখ্যা ছক আকারে পোস্টারে লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের নৈতিক শিক্ষা

সালাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত ও কল্যাণপ্রসূ উপহার। ইহা মানুষকে সকল পাপাচার, অশ্লীলতা ও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের অন্ধমোহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখে। মহান আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط

অর্থ : 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সুরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

সালাত এক বড় নিয়ন্ত্রক শক্তি। প্রকৃত সালাত আদায়কারী মসজিদের বাইরে কোলাহল এবং দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তেও কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে না। সালাত মূলত বান্দার প্রতিটি গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। দুর্বল মন কখনো শয়তানের প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে পড়লে বিবেক তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিছুক্ষণ পরেই তোমাকে মসজিদে গিয়ে মহান প্রভুর দরবারে সিজদাহ্ বা মাথানত অবস্থায় উপস্থিত হতে হবে।

অপকর্ম করে তুমি কীভাবে সে দরবারে উপস্থিত হবে? এ ভাবনা তার মনে প্রবল হয়ে ওঠলে সে আর অন্যায় পথে পা বাড়াতে পারে না। শয়তানি প্রলোভন হতে রক্ষা পায় এবং পুণ্যের পথে ফিরে আসে। প্রত্যেক মুসলমান যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতে আদায় করে, তাহলে অবশ্যই তাদের নৈতিকতার উন্নতি হবে। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি বা অনিয়মের আশ্রয় নিবে না। বরং তারা হয়ে উঠবে এ জাতির আদর্শ মানবসম্পদ।

কাজ : সালাতের নৈতিক শিক্ষা একজন মানুষকে কর্তব্যপরায়ণ করে তোলে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে আলোচনা করবে।

সালাতের সামাজিক শিক্ষা

জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার সামাজিক গুরুত্ব অনেক। এক ইমামের পেছনে সালাত আদায় অর্থ নেতাকে অনুসরণ বোঝায়। জামাআতে সালাত আদায়ের ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকে না। রাজা-প্রজা, ধনী–গরিব, ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত একই সারিতে দাঁড়ায়। এতে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন ঘটে। দৈনিক পাঁচবার জামাআতে সালাত আদায় করলে পরস্পরের খোঁজখবর নেওয়া যায়, বিপদাপদে একে অপরের সাহায্য করা সম্ভব হয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় হয়। তারা সামাজিক দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট হয়। এরূপ ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের অত্যন্ত দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে, তারা জাতির অমূল্য মানবসম্পদে পরিণত হয়।

দায়িত্বশীল পদে নিয়োজিত ব্যক্তিকে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। আর সালাতই হচ্ছে এর উত্তম প্রশিক্ষণ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বসে পরস্পর আলোচনা করে সালাতের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৭

সাওম (اَلصَّوْمُ)

সাওমের ধারণা

'সাওম' আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরত থাকা। শরিয়তের পরিভাষায় সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোযা বলে। রমযান মাসের রোযা পালন করা মুসলমানের ওপর ফরয। যে তা অস্বীকার করবে সে কাফির হবে। বস্তুত রোযা পালনের বিধান পূর্ববর্তী সকল উম্মতের জন্য অপরিহার্য ইবাদত ছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۞

অর্থ : 'হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হলো,যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।' (সুরা বাকারা, আয়াত ১৮৩)

রোযা পালন করলে মানুষ পরস্পর সহানুভূতিশীল হয়। ধনীরা গরিবের অনাহারে,অর্ধাহারে জীবনযাপনের কষ্ট অনুধাবন করতে পারে। ফলে তারা দান-খয়রাতে উৎসাহিত হয়। রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষ হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, ধূমপানে আসক্তি ইত্যাদি বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে। হাদিসে বর্ণিত আছে:

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ অর্থ : 'রোযা হচ্ছে ঢালস্বরূপ।' (বুখারি)

কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হলো রোযা। রোযা পালনের মাধ্যমে পানাহারে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এতে অনেক রোগ দূর হয়। স্বাস্থ্য ভালো থাকে। রোযার ফযিলত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন : 'রমযান এমন একটি মাস, যে মাসে বিশ্বমানবের পথ নির্দেশক, তাঁদের জীবন পথের সুস্পষ্ট বিধানসমূহ, আর হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী কুরআন নাযিল করা হয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসটি পাবে,সে যেন এ মাসে রোযা পালন করে।' (সুরা বাকারা, আয়াত ১৮৫)। এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, রমযান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে এটি অতি পবিত্র মাস। হাদিসে কুদসিতে আছে,

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

অর্থ : 'রোযা কেবল আমারই জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।' (বুখারি)। অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'জান্নাতের রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।' (বুখারি)। রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং আখিরাতে সাওয়াবের আশায় সাওম পালন করে, তার অতীত জীবনের সকল (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)। এ মাস ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। এ মাসে মুমিনের রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোনো রোযা পালনকারীকে ইফতার করাবে,সে তার রোযার সমান সাওয়াব পাবে। অথচ রোযা পালনকারী ব্যক্তির সাওয়াবে বিন্দুমাত্র ঘাটতি হবে না। ফযিলাতের দিক দিয়ে রমযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাতের এবং শেষ অংশ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার।

সাওমের (রোযার) প্রকারভেদ

রোযা ছয় প্রকার। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল ও মাকরুহ।

ক. ফরয রোযা: বছরে শুধু রমযান মাসের রোযা পালন করা ফরয এবং এর অস্বীকারকারী কাফির। রমযানের রোযার কাযাও ফরয। বিনা ওযরে এ রোযা ত্যাগকারী ফাসিক ও গুনাহগার হবে।

খ. ওয়াজিব রোযা: কোনো কারণে রোযা পালনের মানত করলে তা পালন করা ওয়াজিব। কোনো নির্দিষ্ট দিনে রোযা পালনের মানত করলে সেদিনেই পালন করা জরুরি।

গ. সুন্নাত রোযা: রাসুলুল্লাহ (স.) যে সকল রোযা নিজে পালন করেছেন এবং অন্যদের পালন করতে উৎসাহিত করেছেন, সেগুলো সুন্নাত রোযা। আশুরা ও আরাফার দিনে রোযা পালন করা সুন্নাত।

ঘ. মুস্তাহাব রোযা: চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা পালন করা মুস্তাহাব। সপ্তাহের প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এবং শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা পালন করা মুস্তাহাব।

ঙ. নফল রোযা: ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব ছাড়া সকল প্রকার রোযা নফল। যে সকল দিনে রোযা পালন করা মাক্‌রুহ ও হারাম, ঐ সকল দিন ব্যতীত অন্য যেকোনো দিন রোযা রাখা নফল।

চ. মাক্‌রুহ রোযা: ১. মাক্‌রুহ তাহ্‌রিমি, যা কার্যত হারাম। যথা- দুই ঈদের দিনে ও যিলহজ মাসের চাঁদে ১১, ১২, ১৩ তারিখে রোযা পালন করা। ২. মাক্‌রুহ তানযিহি, যেমন- মুহাররাম মাসের ৯ বা ১১ তারিখে রোযা পালন না করে শুধু ১০ তারিখে পালন করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রকার রোযার নাম ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছক আকারে পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৮

সাহ্‌রি (اَلسَّحَرِيُّ)

'সাহ্‌রি' আরবি শব্দ। ইহা সাহারুন শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ ভোর, প্রভাত ইত্যাদি। রমযান মাসে রোযা পালনের উদ্দেশ্যে সুবহি সাদিকের পূর্বে যে খাবার খাওয়া হয়, তাকে সাহ্‌রি বলে। সাহ্‌রি খাওয়া সুন্নাত। রাসুলুল্লাহ (স.) নিজে সাহ্‌রি খেয়েছেন এবং অন্যদেরও খাওয়ার জন্য তাগিদ করতেন। মহানবি (স.) বলেছেন, 'সাহ্‌রি খাওয়া বরকতের কাজ। তোমরা সাহ্‌রি খাও।' (বুখারি)। সুবহি সাদিকের আগেই সাহ্‌রি খাওয়া শেষ করতে হবে। কিন্তু এত আগে সাহ্‌রি খাওয়া উচিত নয় যে, খাওয়ার পর অনেক সময় বাকি থাকে। ফলে অনেকে বিশ্রামের জন্য বিছানায় যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। এতে সালাত কাযা হয়ে যায়।

ইফ্‌তার (اَلْإِفْطَارُ)

'ইফ্‌তার' আরবি শব্দ। এর অর্থ ভঙ্গ করা। ইসলামি পরিভাষায় সূর্যাস্তের পর নিয়তের সাথে হালাল বস্তু পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করাকে ইফ্‌তার বলে। ইফ্‌তার করা সুন্নাত। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। ইফ্‌তার করার সময়

'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা এবং 'আলহামদুল্লিাহ্' বলে শেষ করা উত্তম। তবে নিম্নোক্ত দোয়াটিও পড়া যায়:

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ -

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনার জন্য রোযা পালন করছি এবং আপনার দেওয়া রিযিক দ্বারাই ইফ্তার করলাম।' (আবু দাউদ)। নিজে ইফ্তার করার সাথে সাথে অন্যকেও ইফ্তার করালে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে,সে রোযাদারের সমান সাওয়াব পাবে।' (তিরমিযি)। আমরা অধিক সাওয়াব ও আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশায় নিজে ইফ্তার করব এবং অন্যকেও ইফতার করাব।

সাওম ভঙ্গের কারণ

যে সব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং একটির পরিবর্তে একটি রোযা পালন করা ফরয হয়,তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. ভুলবশত কিছু খেয়ে ফেলার পর রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে।

২. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় পানি পেটে গেলে।

৩. রোযা পালনকারীকে জোর করে কেউ কিছু পানাহার করালে।

৪. ভুলবশত রাত এখনো বাকি আছে মনে করে সুবহি সাদিকের পর সাহ্রি খেলে।

৫. ইফ্তারের সময় হয়েছে মনে করে সূর্যাস্তের আগে ইফ্তার করলে।

৬. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভর্তি বমি করলে।

৭. প্রশ্রাব-পায়খানার রাস্তার মাধ্যমে ঔষধ বা অন্য কিছু ঢুকালে।

সাওম মাক্রুহ্ হওয়ার কারণ

সাওম মাক্রুহ্ হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। নিম্নে কতিপয় কারণ উল্লেখ করা হলো-

১. অন্যের গিবত অর্থাৎ দোষত্রুটি বর্ণনা করলে।

২. মিথ্যা কথা বললে, অশ্লীল আচরণ বা গালমন্দ করলে।

৩. কুলি করার সময় গড়গড়া করলে। কারণ এতে গলার ভেতর পানি ঢুকে গিয়ে রোযা ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে।

৪. যথাসময়ে ইফতার না করলে।

৫. গরমরোধে বারবার গায়ে ঠান্ডা কাপড় জড়িয়ে রাখলে বা বারবার কুলি করলে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সাহ্রি ও ইফতারের সময়সূচি ও দোয়া ছক আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সাওমের (রোযার) কাযা ও কাফফারা (قَضَاءُ الصَّوْمِ وَكَفَّارَتُهُ)

কাযা

কোনো কারণে অনিচ্ছায় যদি রোযা ভেঙ্গে যায় কিংবা কোনো ওযরে তা পালন না করা হয়, তবে একটি রোযার পরিবর্তে একটি রোযাই রাখতে হয়। একে কাযা রোযা বলে।

রোযা কাযা করার কারণসমূহ

১. রোযা পালনকারী রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে বা সফরে থাকলে অথবা অন্য কোনো ওযরের কারণে রোযা পালনে অপারগ হলে।

২. রাত মনে করে ভোরে পানাহার করলে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভর্তি বমি করলে।

৪. জোরপূর্বক রোযা পালনকারীকে কেউ পানাহার করালে।

৫. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় পানি পেটে গেলে।

৬. ভুলক্রমে কোনো কিছু খেতে শুরু করার পর রোযা নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে পুনরায় খেলে।

৭. দাঁত হতে ছোলা পরিমাণ কোনো জিনিস বের করে খেলে।

উল্লিখিত অবস্থায় রোযা নষ্ট হলেও সারা দিন না খেয়ে থাকতে হয় এবং পরে কাযা করতে হয়।

কাফ্ফারা (اَلْكَفَّارَةُ)

ইচ্ছাকৃত রোযা পালন না করলে বা রোযা রেখে বিনা কারণে ভেঙ্গে ফেললে কাযা এবং কাফ্ফারা উভয়ই ফরয হবে।

সাওমের কাফফারা নিম্নরূপ:

১. একাধারে দুই মাস রোযা পালন করা। ২. এতে অক্ষম হলে ৬০ জন মিসকিনকে পরিতৃপ্তির সাথে দুই বেলা খাওয়ানো বা ৩. একজন গোলামকে আযাদ করা।

একাধারে দুই মাস কাফ্ফারার রোযা আদায়কালীন যদি মাসে দুই-একদিন বাদ পড়ে যায়, তবে পূর্বের রোযা বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় নতুন করে দুই মাস রোযা পালন করতে হবে। তবে মহিলাদের ব্যাপারে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা রোযার কাযা ও কাফ্ফারার কারণ পৃথকভাবে পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৯

ইতিকাফ (اَلْاِعْتِكَافُ)

'ইতিকাফ' আরবি শব্দ। এর অর্থ অবস্থান করা, আটকে থাকা। শরিয়তের পরিভাষায় সাংসারিক কাজকর্ম ও পরিবার থেকে আলাদা হয়ে মসজিদে ইবাদতের নিয়তে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলা হয়।

ইতিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া। এলাকাবাসীর মধ্য থেকে একজন আদায় করলেই আদায় হয়ে যাবে। আর কেউ আদায় না করলে সকলেই দায়ী হবে। ইতিকাফকারী দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়। ফলে সে অনর্থক কথাবার্তা ও যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে থাকে। আল্লাহর সাথে মনের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। একাগ্রচিত্তে কয়েক দিন ইবাদতের ফলে তার মনে আল্লাহর ভীতি গভীরভাবে সৃষ্টি হয়। ফলে দুনিয়ার চাকচিক্য তাকে আল্লাহর যিকর (স্মরণ) হতে দূরে সরাতে পারে না। ইবাদতে তার মনে শান্তি আসে। ইতিকাফের ফযিলত অনেক। রাসুলুল্লাহ (স.) নিয়মিতভাবে প্রতিবছর ইতিকাফ করতেন। হাদিসে আছে, 'রাসুলুল্লাহ (স.) প্রতি রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। এ আমল তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত বহাল ছিল। মহানবি (স.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর বিবিগণও এ নিয়ম পালন করেন।' (বুখারি)

রমযান মাসে লাইলাতুল কদর নামে একটি বরকতময় রাত আছে। যে রাত হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। রমযানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে লাইলাতুল কদর খুঁজতে মহানবি (স.) নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময় ইতিকাফ অবস্থায় থাকলে লাইলাতুল কদর লাভের সৌভাগ্য হতে পারে।

আদায়ের নিয়ম

রমযানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফ করা সুন্নাত। এর সর্বনিম্ন সময় একদিন একরাত। রমযান মাস ছাড়াও মুস্তাহাব ইতিকাফ যেকোনো সময় পালন করা যায়। স্ত্রীলোক নিজ ঘরে নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ করতে পারেন।

কাজ : 'ইতিকাফের মাধ্যমে লাইলাতুল কদর পাওয়া সম্ভব।' দলে বিভক্ত হয়ে এ নিয়ে বিতর্কের আয়োজন করবে।

সাদাকাতুল ফিতর (صَدَقَةُ الْفِطْرِ)

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে রোযার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, গরিব-দুঃখীদের সহযোগিতায় (খাদ্য স্বরূপ) যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সম্পদ দান করা হয়, তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে।

মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ (সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য বা সমপরিমাণ অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলে তাকে নিসাব বলে) সম্পদের মালিক প্রত্যেক স্বাধীন মুসলিম নর নারীর ওপর 'সাদাকাতুল ফিতর' ওয়াজিব। শিশু, পরাধীন (গোলাম) ব্যক্তির সাদাকা অভিভাবক আদায় করবে।

তাৎপর্য

যে বছর রোযা ফরয হয়, সে বছরই রাসুলুল্লাহ (স.) মুসলমানদের সাদাকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেন।

মুসলমানগণ পবিত্র রমযান মাসে রোযা পালন করে। আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতে মশগুল থাকে। এসব দায়িত্ব পালনে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়। রোযা পালনে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তার ক্ষতিপূরণের জন্য শরিয়তে রমযানের শেষে 'সাদাকাতুল ফিতর', ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। ফিতর পেলে গরিব-অনাথ লোকেরাও ঈদের খুশিতে অংশীদার হতে পারে। এভাবেই ধনী-গরিবের মধ্যে ব্যবধান কমে আসে এবং সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যভাব গড়ে ওঠে। হাদিসে আছে, 'সাদাকাতুল ফিতর' দ্বারা সাওম পালনের সকল দোষত্রুটি দূরীভূত হয়, গরিবের পানাহারের ব্যবস্থা হয়।" (আবু দাউদ)।

আদায়ের নিয়ম

ঈদের সালাতের পূর্বে নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করতে হয়। ঈদের দুই একদিন আগে 'সাদাকাতুল ফিতর, আদায় করা যায়। তবে ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে ঈদের মাঠে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করা উত্তম। ঈদের পর কেউ ইহা আদায় করলে, আদায় হবে কিন্তু সাওয়াব কম হবে।

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

মাথাপিছু নিস্‌ফে সা অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই কেজি গম বা যব বা তার মূল্য আদায় করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায়ের গুরুত্বের ওপর দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্কের আয়োজন করবে।

পাঠ ১০

সাওমের (রোযার) নৈতিক শিক্ষা

সাওম (রোযা) পালনের মাধ্যমে বান্দা একদিকে আল্লাহর নির্দেশ পালন করে,অপরদিকে তার নৈতিকতারও বিশেষ উন্নয়ন ঘটায়। রোযার অনেক নৈতিক শিক্ষার মধ্যে কতিপয় শিক্ষা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. সংযম

মানুষের মধ্যে যেমন মানবিক ভালো গুণ থাকে, তেমনি তার মধ্যে জৈবিক ও পাশবিক শক্তিও থাকে। পাশবিক শক্তি তাকে স্বেচ্ছাচারিতার পথে পরিচালিত করে। স্বেচ্ছাচারিতার কারণে সমাজে অনাচার, কোন্দল, কলহ ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের স্বীয় প্রবৃত্তিকে সংযমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। রোযা মানুষকে এই সংযম শিক্ষা দেয়। মানুষের নফস বা প্রবৃত্তি তাকে তার খেয়ালখুশি মতো চলতে এবং সকল প্রকার অন্যায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। রমযানের রোযা এই অবাধ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৈধ পানাহার ও অন্যান্য জৈবিক চাহিদা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। এই রোযা চরম খাদ্যবিলাসী ও স্বেচ্ছাচারিতাকে সংযমী করে তোলে। পূর্ণ এক মাস এই সংযম মেনে চলার প্রশিক্ষণ তাকে গোটা বছর সংযমী হয়ে চলতে সাহায্য করে।

কাজ : 'মানুষের কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রোযার সংযম শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা রাখে।' শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে পক্ষে বিপক্ষে বিতর্ক করবে।

২. সহমর্মিতা

যে ব্যক্তি কখনো অনাহারে থাকেনি, সে কীভাবে ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করবে? আর যে কখনো রোগাক্রান্ত হয় নি,সে কীভাবে রোগযন্ত্রণা অনুভব করবে? কোনো অভুক্ত পিপাসার্ত ভিক্ষুক বিত্তশালীদের দ্বারে উপস্থিত হয়ে যেন বিদ্রূপের শিকার না হয়। এটা রোযার অন্যতম শিক্ষা (অর্থাৎ অসহায় ক্ষুধার্তের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াও রোযার শিক্ষা)। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, সকল মুমিন বান্দা সুবহি সাদিক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুধার জ্বালা বুঝতে পারে। গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয়, আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম থাকে, তখন ধনীর দুলাল হোক আর গরিবের সন্তান হোক ক্ষুধার জ্বালা ও পিপাসার কাতরতা সমভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। একইভাবে রোযাদার ব্যক্তির দ্বারে যখনই কোনো অনাহারী অভুক্ত মানুষ আসবে, তখন অবশ্যই তার মনে দয়া বা সহমর্মিতা সৃষ্টি হবে। ধনী ও গরিবের মধ্যে আন্তরিকতা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা রোযাপালনের মাধ্যমে যতটা বৃদ্ধি পায়, অন্য কোনো ইবাদতের মাধ্যমে এগুলো এত বেশি সৃষ্টি হয় না।

এই উপলব্ধির বাস্তবতা পরীক্ষার জন্য রোযাদার ব্যক্তিকে ইফতার করানোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একজন রোযাদার অপরকে ইফতার করানোর মানেই হচ্ছে সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ।

কাজ : 'গরিবের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে সাওমের সহমর্মিতা শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা রাখে।' শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্ক করবে।

৩. সহিষ্ণুতা

সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য মুমিনের জন্য এক বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিগতভাবে মানুষের অন্তর থাকে অস্থির ও চঞ্চল। যদি কোনো দ্রব্য তার আওতার মধ্যে থাকে, তবে তা পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনের এ অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে নিজ ইচ্ছেমতো কাজ করলে সমাজে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে। একমাত্র সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মনের কু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনাই এ ধৈর্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। রোযা পালনকারী দিনের বেলায় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছু পানাহার করে না ও অন্যায় কাজ করে না। এমনকি জৈবিক চাহিদাটুকুও দমন করে রাখে। এটি ধৈর্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। কেউ যদি অভাব অনটনের কারণে আহারাদি সংগ্রহে অপারগ হয়, তবে রোযার মাধ্যমে অর্জিত ধৈর্যই হতে পারে তার একমাত্র অবলম্বন। এতে একদিকে যেমন রক্ষা হয় ইমান,তেমনি অপরদিকে শান্ত হয় পরিবার ও সমাজ।

কাজ : ইবাদত অধ্যায়ের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরবর্তী জীবনে কীভাবে কাজে লাগবে এর একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টার পেপারে লিখবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ

১. জামাআতে সালাত আদায় ..... ঐক্যের প্রতিফলন ঘটায়।

২. মুসাফিরের জন্য ..... নামায আদায় করার অনুমতি আল্লাহ্ তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহ।

৩. রুগ্‌ণ ব্যক্তিকে ..... থাকা পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই নামায আদায় করতে হবে।

৪. যিলহজ মাসের ..... তারিখ যে উৎসব পালন করে থাকে,তাকে ঈদুল আযহা বলে।

৫. তারাবিহের নামায আদায় সুন্নাতে .....।

বাম পাশের বাক্যাংশর সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. জুমার নামায	রমযান মাসে পাওয়া যায়
২. বেহুঁশ ব্যক্তির	তাকওয়া অর্জন
৩. লাইলাতুল কদর	মসজিদে পড়তে হয়
৪. রোযার মূল উদ্দেশ্য	কাযা করতে হয়
৫. অনিচ্ছায় রোযা ভাঙলে	নামায কাযা করতে হয় না

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জামাআত নামাযে ইমামের কর্তব্য সম্পর্কে লেখো।

২. ঈদের দিনের সুন্নাত কাজগুলো কী লেখো।

৩. রোযার কাফ্‌ফারার বর্ণনা দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মাসবুকের সালাম বলতে কী বোঝায়? মাসবুকের সালাত আদায়ের নিয়ম লেখো।

২. রুগ্‌ণ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়ম লেখো।

৩. 'নৈতিকতা অর্জনে রোযার গুরুত্ব অপরিসীম'–ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মানুষকে সংযম শিক্ষা দেয় কোন ইবাদত?

ক. সালাত খ. যাকাত
গ. সাওম ঘ. হজ।

২. 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' আদায়ের মাধ্যমে –

i. সাওম পালনের সকল দোষত্রুটি দূরীভূত হয়

ii. ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়

iii. গরিবের পানাহারের ব্যবস্থা হয়

কোনোটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ধনাঢ্য ব্যক্তি রহিম সাহেব, সেহ্‌রি খেয়ে যথারীতি রোযা শুরু করলেন। দুপুরে প্রচণ্ড গরম পড়াতে ইচ্ছা করে ভাত খেয়ে নিলেন। পরবর্তীতে তিনি কাযা হিসেবে একটি রোযা আদায় করলেন।

৩. রহিম সাহেবের কাজের মাধ্যমে লঙ্ঘিত হয়েছে–

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত ঘ. নফল।

৪. উপযুক্ত কারণে রহিম সাহেবকে–

i. কাযা করতে হবে

ii. কাফারা আদায় করতে হবে

iii. একাধারে এক মাস রোজা আদায় করতে হবে

কোনোটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আসলাম ও আসগর সপ্তম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র। ২য় সাময়িক পরীক্ষার সময় রমযান মাস থাকায় পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কথা ভেবে আসলাম রোযা ছেড়ে দেয়। মাঝেমধ্যে সালাত আদায়েও সে গাফলতি করে। অন্যদিকে কষ্টকর হলেও আসগর নিয়মিত রোযা পালন করে। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে ওয়াক্ত হলেই নামায আদায় করে নেয়। পিতার সাথে মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদের নামাযও আদায় শেষে ভালো ফলাফলের জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। আসগর আসলামকে

নিয়মিত সালাত ও সাওম পালনের ব্যাপারে বললে, আসলাম বলে, এই মুহূর্তে পরীক্ষায় ভালো ফলাফলই আমার নিকট মুখ্য। পরবর্তীতে আসগর তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষককে আসলামের বক্তব্যটি জানালে তিনি বললেন, আসলাম, তোমার কথা দ্বারা ইবাদতের প্রতি অবজ্ঞা বুঝাচ্ছে,যা ইবাদতকে অস্বীকার করারই শামিল।

ক. ধৈর্যের বিনিময় কী?

খ. সাদাকাতুল ফিতর বলতে কী বুঝ?

গ. আসলামের মনোভাবে কী প্রকাশ পেয়েছে ? শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আসগরের কাজের পরকালীন পরিণতি কুরআন-হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। সুলতান মিয়া একজন কৃষক। সারাদিন তিনি মাঠেই কাজ করেন। নামাযের সময় হলে ক্ষেতের পাশে কাপড় বিছিয়ে নামায আদায় করেন। জুমার দিনে মসজিদে না গিয়ে যুহরের সালাত আদায় করেন। তার প্রতিবেশী হারুন তাকে বলল, 'জুমার নামায' জামাআত ব্যতীত আদায় হয় না। আমি মসজিদে যাচ্ছি। তুমিও আমার সাথে চলো। তখন সুলতান বলে, 'মসজিদ অনেক দূরে। কাজের ক্ষতি হবে বলেই ক্ষেতের পাশে যুহর নামায আদায় করছি।'

ক. 'জুমার সালাত' কোনোদিনে আদায় করতে হয়?

খ. মুসাফির বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. জুমার নামাযের ব্যাপারে সুলতান মিয়ার মনোভাবে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হারুন মিয়ার বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী। এটি মানবজাতির জন্য একটি বিশেষ নিয়ামত। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলা এটি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর নাযিল করেছেন। আর নবি করিম (স.) আমাদের নিকট এ পবিত্র বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ নিজে আমল (কাজ) করে তিনি আমাদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি মানুষের নিকট এ বাণীর মর্ম ও তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর এ সমস্ত বাণী ও কর্মকে বলা হয় হাদিস। হাদিস আল-কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। ইসলামি বিধি বিধান পূর্ণরূপে পালন করার জন্য আল-কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক।

এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী-

- আল-কুরআনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
- মাদ্দ ও ওয়াক্‌ফসহ তাজবিদ অনুযায়ী বিশুদ্ধভাবে কুরআন পা করতে পারবে।
- বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠে আগ্রহী হবে।
- আল–কুরআনের নির্বাচিত পাঁচটি সুরা অর্থসহ মুখস্থ বলতে ও মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নির্বাচিত সুরাগুলোর পটভূমি (শানে নুযুল) বর্ণনা করতে পারবে।
- মুনাজাতমূলক (প্রার্থনামূলক) তিনটি আয়াত অর্থসহ বলতে পারবে।
- হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
- কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী নৈতিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত হবে।
- প্রার্থনামূলক তিনটি হাদিস অর্থসহ বলতে পারবে।
- নৈতিক গুণাবলিবিষয়ক তিনটি হাদিস অর্থসহ বলতে পারবে।
- হাদিসের আলোকে মানবপ্রেম ও পরমত সহিষ্ণুতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- হাদিসের আলোকে মানবপ্রেম ও পরমত সহিষ্ণুতামূলক আচরণ প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠ ১

কুরআন মাজিদ

আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী। এটি মুসলিমগণের ধর্মগ্রন্থ। কুরআন মাজিদ বরকতময় গ্রন্থ। মানুষের প্রতি এটি আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে এটি নাযিল করেন। আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সর্বশেষে নাযিল করা হয়েছে। এরপর আর কোনো কিতাব আসে নি। আর ভবিষ্যতেও আসবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের বিধিবিধান ও শিক্ষা বলবৎ থাকবে। এটি সর্বকালের সকল মানুষের জন্য হেদায়াতের উৎস স্বরূপ। আল-কুরআনের নির্দেশনা মেনে চললে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি ও সম্মান পাবে। আর আখিরাতে চিরশান্তির জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

অর্থ : 'এই কিতাব আমি নাযিল করেছি, যা কল্যাণময়। অতএব, তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।' (সুরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫৫)

অবতরণ

আল্লাহ তাআলা আল-কুরআন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর নাযিল করেন। আল-কুরআন 'লাওহে মাহফুজ' বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। 'লাওহে মাহফুজ' অর্থ সংরক্ষিত ফলক। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

অর্থ : 'বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।' (সুরা বুরুজ, আয়াত ২১-২২)

লাওহে মাহফুজ থেকে আল-কুরআন প্রথমে কদরের রাতে প্রথমে আসমানের 'বায়তুল ইয্যাহ' নামক স্থানে একসাথে অবতীর্ণ হয়। এটি ছিল রমযান মাসের লাইলাতুল কদর বা মহিমান্বিত রাত। আমরা এ রাতকে শবে কদরও বলে থাকি। এরপর প্রথম আসমান থেকে অল্প অল্প করে পুরো কুরআন মাজিদ প্রিয় নবি (স.)-এর ওপর নাযিল করা হয়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। তিনি আরব দেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় গোটা আরব ছিল অজ্ঞতা ও বর্বতায় আচ্ছন্ন। তারা নানা মূর্তির পূজা করত। নানারূপ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করত। ঐতিহাসিকগণ সে সময়কে 'আইয়ামে জাহেলিয়া' নামে আখ্যায়িত করেছেন। আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতার যুগ।

নবি করিম (স.) আরবদের এরূপ অজ্ঞতা ও বর্বরতা পছন্দ করতেন না। তিনি সব সময় সত্য ও সুন্দরের অনুসন্ধান করতেন। এ জন্য তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই তাঁর নিকট সর্বপ্রথম কুরআনের বাণী নাযিল হয়। তিনি সত্যের সন্ধান পান। তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। আল্লাহ তাআলা তাঁকে শেষ নবি ও রাসুল হিসেবে মনোনীত করেন। এসময় মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আ.) সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করেন। এটিই ছিল সর্বপ্রথম ওহি। এরপর মহানবি (স.) আরও ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর

জীবদ্দশায় আল্লাহ তা আলা প্রয়োজন অনুসারে আল-কুরআনের বিভিন্ন অংশ অল্প অল্প করে নাযিল করেন। এভাবে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে আল-কুরআন সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হয়।

আল–কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটি সংরক্ষণ করার দায়িত্বও তাঁরই। তিনি স্বয়ং আল-কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ

অর্থ : 'নিশ্চয়ই এর (আল-কুরআন) সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।' (সুরা কিয়ামাহ, আয়াত ১৭)

আল্লাহ আরও বলেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

অর্থ : 'নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।' (সুরা হিজর, আয়াত ৯)

আল-কুরআনের সংরক্ষক স্বয়ং মহান আল্লাহ। এ জন্য আজ পর্যন্ত এটির কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি। আর ভবিষ্যতেও হবে না। এটি সকল প্রকার পরিবর্তন হতে মুক্ত। কেউ এতে নতুন কোনো কিছু সংযোজন করতে পারে না। আবার এর থেকে কোনো কিছু বাদও দিতে পারে না। আল-কুরআনের প্রতিটি হরকত, নুকতা, শব্দ, বাক্য সবকিছুই অপরিবর্তিত।

আল–কুরআন সংরক্ষণ

আল-কুরআন সর্বপ্রথম হিফয করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। হিফয হলো মুখস্থ করা। যাঁরা পবিত্র কুরআন হিফয করেন তাঁদেরকে বলা হয় হাফিয। আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তারা খুব সহজেই নানা জিনিস স্মরণ রাখতে পারত। সম্ভবত আল-কুরআন মুখস্থ করার জন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁদের এরূপ স্মৃতিশক্তি দান করছিলেন। কুরআন মাজিদের কোনো অংশ নাযিল হলে সর্বপ্রথম মহানবি (স.) তা নিজে মুখস্থ করে নিতেন। এরপর তা সাহাবিগণকে মুখস্থ করতে বলতেন। মহানবি (স.)-এর উৎসাহ ও নির্দেশে সাহাবিগণ আল-কুরআন মুখস্থ করে রাখতেন। এভাবে কুরআন মাজিদ স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করা হয়।

আল-কুরআন লেখনীর মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা হয়। কুরআনের কোনো অংশ নাযিল হলে তা মুখস্থ করার পাশাপাশি লিখে রাখার জন্যও নবি করিম (স.) নির্দেশ দিতেন। যে সকল সাহাবি লিখতে জানতেন তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁদের বলা হয় কাতেবে ওহি বা ওহি লেখক। এঁদের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। প্রধান ওহি লেখক সাহাবি ছিলেন হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা.)। ওহি লেখক সাহাবিগণ সর্বদা নবি (স.)-এর সাথে থাকতেন। কুরআনের কোনো অংশ নাযিল হলে তাঁরা সাথে সাথেই তা লিখে রাখতেন। সে সময় আজকের ন্যায় কাগজ কিংবা কম্পিউটার ছিল না। তাই তখন কুরআন মাজিদ খেজুর গাছের ডাল, পশুর হাড়, চামড়া, ছোট ছোট পাথর ইত্যাদিতে লিখে রাখা হতো। এভাবেও কুরআন মাজিদ সংরক্ষণ করা হয়।

আল–কুরআন সংকলন

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবদ্দশায় আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়। ফলে সে সময় গ্রন্থাকারে তা সংকলন করা হয় নি। বরং সেসময় হিফয ও লেখনীর সাহায্যে আল-কুরআনকে সংরক্ষণ করা হয়। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পর আল-কুরআন সংকলন করা হয়।

মহানবি (স.)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা মনোনীত হন। সে সময় কতিপয় ভণ্ড নবির আবির্ভাব ঘটে। হযরত আবু বকর (রা.) সেসব ভণ্ড নবির বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেন। এ রকমই একটি যুদ্ধ ছিল ইয়ামামার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ভণ্ডনবি মুসায়লিমা কায্যাবের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ করেন। তবে কুরআনের বহুসংখ্যক হাফিয শাহাদত বরণ করেন। এ অবস্থা দেখে হযরত উমর (রা.) ভাবলেন- কুরআনের হাফিযগণ এভাবে ইন্তিকাল করলে এর অনেক অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে কুরআন সংকলন করার পরামর্শ দেন। হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শ শুনে হযরত আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। তিনি প্রধান ওহি লেখক সাহাবি হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)-কে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশে হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) সাহাবিদের নিকট সংরক্ষিত কুরআনের লিখিত অংশগুলো একত্র করেন। পাশাপাশি তিনি কুরআনের হাফিযগণের সাহায্যও গ্রহণ করেন। কুরআনের প্রতিটি অংশ তিনি লেখনী ও মুখস্থ এ উভয় পদ্ধতির সাথে মিলিয়ে দেখেন। এভাবে তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে আল-কুরআনের প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। আল-কুরআনের এ কপিটি খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর তা দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকে। হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদতের পর এ কপিটি তাঁর মেয়ে উম্মল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত থাকে।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তাঁর সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্য ছিল বিশাল-বিস্তৃত। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ও দেশে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। এ সময় বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআনের পাঠরীতি নিয়ে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। এমনকি এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানা অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রা.) বিশিষ্ট সাহাবিগণের সাথে পরামর্শ করে আল-কুরআনের একক ও প্রামাণ্য পাঠরীতি প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ জন্য তিনি হযরত যায়দ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপি থেকে আরও সাতটি অনুলিপি প্রস্তুত করেন। এরপর বিভিন্ন প্রদেশে আল-কুরআনের এক এক কপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে পবিত্র কুরআনের পাঠরীতি নিয়ে মুসলমানদের অনৈক্য দূর হয়। আল-কুরআন সংরক্ষণের এরূপ অসামান্য অবদানের জন্য হযরত উসমান (রা.)-কে জামিউল কুরআন বলা হয়। জামিউল কুরআন অর্থ কুরআন সংকলক বা কুরআন একত্রকারী।

কাজ: এই পাঠ পড়ে কুরআন সংকলন সম্পর্কে শিক্ষার্থী কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে একটি সারসংক্ষেপ লিখবে।

পাঠ ২

তাজবিদ (تَجْوِيْدٌ)

তাজবিদ আরবি শব্দ। এর অর্থ সুন্দর করা, বিন্যস্ত করা, সুন্দর করে সাজানো ইত্যাদি। আর ইসলামি পরিভাষায় আল-কুরআনকে শুদ্ধভাবে সুন্দর সুরে পাঠ করাকে তাজবিদ বলা হয়। কুরআন মাজিদ পড়ার বেশ কিছু নিয়মকানুন রয়েছে।

যেমন: মাখরাজ, সিফাত জানা এবং মাদ্দ, ওয়াক্‌ফ, গুন্নাহ ইত্যাদির নিয়ম সম্পর্কে অবগত হওয়া। এসব নিয়মকানুন সহকারে শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত করাকেই তাজবিদ বলা হয়। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা মাখরাজ সম্পর্কে জেনে এসেছি। এ শ্রেণিতে আমরা তাজবিদের আরও কিছু নিয়মকানুন জানব।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত অনেক। এটি নফল ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত। কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَّالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ○

অর্থ : 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফও পাঠ করবে,সে একটি নেকি লাভ করবে। আর এ নেকির পরিমাণ হলো দশগুণ।' (তিরমিযি)

পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ বা বর্ণ তিলাওয়াতের দশটি করে সাওয়াব লেখা হয়। যেমন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম)-এর মধ্যে ১৯টি বর্ণ রয়েছে। কেউ যদি এটি তিলাওয়াত করে তবে সে (১৯X১০) = ১৯০টি নেকি লাভ করবে।

অন্য হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন, 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা কিয়ামতের দিন তা পাঠকারীদের পক্ষে সুপারিশ করবে'। (মুসলিম)

কুরআন শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে তিলাওয়াতের মাধ্যমে তিলাওয়াতের এসব ফযিলত লাভ করা যায়। এ জন্য তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করা অত্যাবশ্যক। তাজবিদ সহকারে কুরআন পড়া আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। তিনি বলেছেন-

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ○

অর্থ : 'আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।' (সুরা মুযযাম্মিল, আয়াত ৪)

তাজবিদ না জেনে কুরআন পাঠ করলে তা শুদ্ধ হয় না। আর কুরআন পাঠ শুদ্ধ না হলে নামায সঠিকভাবে আদায় হয় না। এরূপ তিলাওয়াতকারী কোনো সাওয়াবও লাভ করবে না।

সুতরাং আমরা শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করব। আর এ জন্য প্রথমেই তাজবিদ শিক্ষা করব। এরপর কুরআন পাঠের সময় এ নিয়মগুলোর অনুশীলন করব।

পাঠ ৩

মাদ্দ (مَدٌّ)

মাদ্দ শব্দের অর্থ দীর্ঘ করা, লম্বা করা। তাজবিদের পরিভাষায় মাদ্দের হরফের ডান দিকের হরকতযুক্ত হরফ লম্বা করে পড়াকে মাদ্দ বলা হয়। যের, যবর ও পেশকে হরকত বলে।

মাদ্দের হরফ মোট তিনটি। যথা- আলিফ, ওয়াও, ইয়া (ا-و-ى)।

এ তিনটি হরফ নিম্নলিখিত অবস্থায় মাদ্দের হরফ হিসেবে উচ্চারিত হয় :

ক. ا (আলিফ)-এর পূর্বের হরফে যবর (ـَ) থাকলে। যেমন-بَا

খ. و (ওয়াও)-এর ওপর জযম (ـْ) এবং তার ডান পাশের হরফে পেশ (ـُ) থাকলে। যেমন-بُوْ

গ. ى (ইয়া)-এর ওপর জযম (ـْ) এবং এর ডান পাশের অক্ষরে যের (ـِ) থাকলে। যেমন-بِيْ

উপর্যুক্ত তিনটি অবস্থায়- ا-و-ى মাদ্দের হরফ হিসেবে গণ্য হয়। ফলে এর পূর্বের অক্ষর একটু দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

প্রকারভেদ

মাদ্দ প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

১. মাদ্দে আসলি (মূল মাদ্দ)

২. মাদ্দে ফারঈ (শাখা মাদ্দ)

নিম্নে এ দুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো :

১. মাদ্দে আসলি (মূল মাদ্দ)

মাদ্দের হরফের ডানে বা পরে জযম (ـْ), বা হামযা (ء) কিংবা তাশদিদ (ـّ) না থাকলে তাকে মাদ্দে আসলি বলে। মাদ্দে আসলিকে মাদ্দে তাব্‌য়িও বলা হয়। এরূপ মাদ্দে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

উল্লেখ্য, একটি সোজা আঙ্গুলকে স্বাভাবিকভাবে বাঁকা করে হাতের তালুতে লাগাতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে এক আলিফ পরিমাণ সময় বলে।

মাদ্দে আসলির উদাহরণ : نُوْحِيْهَا

এ শব্দটিতে একসাথে মাদ্দে আসলির তিন ধরনের উদাহরণ রয়েছে। যেমন-

ক. نُوْ এখানে و (ওয়াও)-এর ওপর জযম (ـْ) এবং তার পূর্বের হরফ ن (নুন)-এর ওপর পেশ (ـُ) রয়েছে।

খ. حِيْ এখানে ى (ইয়া)-এর ওপর জযম (ـْ) এবং এর পূর্বের হরফ ح (হা)-এর নিচে যের (ـِ) রয়েছে।

গ. هَا এখানে ا (আলিফ)-এর পূর্বের হরফ ه (হা)-এর ওপর যবর (ـَ) রয়েছে।

এ তিনটি ক্ষেত্রেই মাদ্দের হরফ ا-و-ى এর পূর্বে বা পরে জযম (ـْ) বা, হামযা (ء) বা তাশদীদ (ـّ) নেই। সুতরাং এগুলো মাদ্দে আসলি। এরূপ অবস্থায় ن-ح-ه (নুন, হা, হা) অক্ষরকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

কুরআন মাজিদের যে সকল হরফের ওপর খাড়া যবর (ـٰ), নিচে খাড়া যের (ـٖ) এবং ওপরে উল্টো পেশ (ـٗ) রয়েছে, সে সকল হরফকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যেমন-

الوالناس
لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ
مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ

এখানে ل (লাম) হরফের ওপর খাড়া যবর (ـَـ), ه (হা) হরফের নিচে খাড়া যের (ـِـ) এবং ه (হা) হরফের ওপর উল্টো পেশ (ـُـ) রয়েছে। সুতরাং, ل-ه-ه (লাম, হা, হা) হরফগুলোকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

২. মাদ্দে ফারঈ (শাখা মাদ্দ)

ফারঈ অর্থ শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। মাদ্দে আসলি থেকে যে সকল মাদ্দ বের হয় তাকে মাদ্দে ফারঈ বলে। অর্থাৎ মাদ্দের হরফের পরে জযম (ـْـ) বা হামযা (ء) বা তাশদিদ (ـّـ) থাকলে সেসব স্থানে দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে মাদ্দে ফারঈ বলে।

উদাহরণ

ক. آلْآنَ - এ শব্দে মাদ্দের হরফ এর পর লাম হরফে জযম (ـْـ) হয়েছে। এটি মাদ্দে ফারঈ। অতএব, আমরা এ স্থানে হামযাকে লম্বা করে পড়ব।

খ. جَآءَ-وَمَآ اَدْرٰكَ - এ উদাহরণ দুটিতে মাদ্দের হরফ আলিফ এর পর হামযা এসেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জিম (ج) ও মিম (م) হরফকে মাদ্দে ফারঈ হিসেবে দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

গ. وَلَا الضَّآلِّيْنَ-كَآفَّةً - আলোচ্য উদাহরণদ্বয়ে মাদ্দের হরফ আলিফ এর পর লাম (ل) এবং ফা (ف) হরফে তাশদিদ (ـّـ) হয়েছে। এটি মাদ্দে ফারঈ-এর অন্যতম রূপ। এরূপ ক্ষেত্রেও হরফকে লম্বা করে পড়তে হবে।

উল্লেখ্য, আল কুরআনের অনেক স্থানে হরফের ওপর এসব মাদ্দের চিহ্ন দেওয়া থাকে। যেমন- (ـٓـ), (ـٰـ)॥ হরফের ওপর এরূপ চিহ্ন থাকলে সে হরফকে লম্বা করে পড়তে হয়। হরফের উপর (ـٓـ) চিহ্ন থাকলে চার আলিফ এবং (ـٰـ) চিহ্ন থাকলে তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যেমন- اُولٰٓئِكَ-مَآ اَغْنٰى

কাজ

ক. শিক্ষার্থী মাদ্দের প্রকারভেদের একটি চার্ট তৈরি করবে।

খ. মাদ্দের নাম ও কোন মাদ্দ কয় আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয় শিক্ষার্থী নিজ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৪

ওয়াকফ (وَقْفٌ)

ওয়াক্‌ফ আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরতি দেওয়া, থামা, স্থগিত রাখা ইত্যাদি। তাজবিদের পরিভাষায় তিলাওয়াতের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে বিরতি দেওয়াকে ওয়াক্‌ফ বলে। অন্য কথায়, দুই নিঃশ্বাসের মধ্যবর্তী বিরতির সময়কে ওয়াকফ বলা হয়।

আল-কুরআন তিলাওয়াতে ওয়াক্‌ফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমরা বেশি সময় নিঃশ্বাস ধরে রাখতে পারি না। কিছুক্ষণ পরপর আমাদের শ্বাস নিতে হয়। তিলাওয়াতের সময়ও একশ্বাসে পুরো তিলাওয়াত করা সম্ভব নয়। এ জন্য আয়াতের মধ্যে থামতে হয়। আয়াতের মধ্যে এরূপ বিরতি নেওয়াই ওয়াক্‌ফ।

তাজবিদ হলো কুরআন সুন্দর ও শুদ্ধরূপে তিলাওয়াতের নাম। সুতরাং তিলাওয়াতকালে যেখানে ইচ্ছা সেখানে থামা যাবে না। তাতে কুরআন তিলাওয়াতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। অনেক সময় অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। অতএব, নির্ধারিত স্থানে ওয়াকফ করতে হবে। আমাদের প্রিয় নবি (স.) সুরা ফাতিহার প্রত্যেক আয়াতের পর ওয়াকফ করতেন। ওয়াক্‌ফ করলে শেষ হরফের ওপর জযম উচ্চারণ করতে হবে। কোনো হরকত (যবর, যের, পেশ) উচ্চারণ করে থামা যাবে না। তবে কেউ অপারগ হলে বা শ্বাস রাখতে না পারলে নির্ধারিত স্থানের পূর্বেই ওয়াক্‌ফ করতে পারবে। এক্ষেত্রে তিলাওয়াত করার সময় পুনরায় যে শব্দে ওয়াক্‌ফ করেছে, সে শব্দ থেকে তিলাওয়াত করতে হবে।

আল-কুরআনে ওয়াকফের নানা রকম চিহ্ন দেওয়া আছে। এগুলো হলো বিরাম চিহ্ন। এগুলো সম্পর্কে জানা থাকলে শুদ্ধভাবে ওয়াকফ করা যায়। নিম্নে এ সমস্ত চিহ্নসমূহের পরিচয় দেওয়া হলো-

○- এ চিহ্নকে বলা হয় 'ওয়াক্‌ফ তাম'। এটি বাক্য বা আয়াতের চিহ্ন। অর্থাৎ এ চিহ্ন দ্বারা আয়াত শেষ হওয়া বোঝা যায়। এ চিহ্নে থামতে হবে।

م - একে 'ওয়াক্‌ফ লাযিম' বলে। এ চিহ্নে ওয়াক্‌ফ করা অত্যাবশ্যক। এতে ওয়াক্‌ফ না করলে আয়াতের অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

ط - এটি 'ওয়াকফ মুতলাক' এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নে ওয়াক্‌ফ করা উত্তম।

ج - এটি 'ওয়াক্‌ফ জায়িয' এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা কিংবা না থামা উভয়ই জায়েয। তবে এতে ওয়াক্‌ফ করা ভালো।

ز - একে 'ওয়াক্‌ফ মুজাওয়ায' বলে। এ চিহ্নে না থামা ভালো।

ص - এ চিহ্নকে বলা হয় 'ওয়াক্‌ফ মুরাখ্‌খাস'। এখানে না থামা ভালো। তবে অপারগ হলে এ স্থানে থামা যাবে।

ق - এ চিহ্নে থামা ও না থামা প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। তবে এতে না থামা ভালো।

قف - এটি ওয়াকফ্ আমর। অর্থাৎ এতে থামার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে থামা উচিত।

لا - এটি না থামার নির্দেশ। এরূপ স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়তে হবে।

صل - এ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দেওয়া বা না দেওয়া উভয়ই জায়েয। তবে বিরতি দেওয়াই উত্তম।

صلى - এ স্থানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

س/سكته - এ চিহ্নের নাম সাকতাহ। এরূপ চিহ্নিত স্থানে শ্বাস ছাড়া যাবে না। অর্থাৎ পড়া বন্ধ থাকবে তবে শ্বাস জারি থাকবে।

ث/مع/معانقة - এ চিহ্নের নাম মুআনাকা। আয়াতের বা শব্দের ডানে এবং বামে (তিনবিন্দু) অথবা مع চিহ্ন থাকে। এ অবস্থায় তিলাওয়াতকালে এক স্থানে থামতে হয় এবং অপর স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়।

وقف النبى - ওয়াকফুন নাবি (স.)। এরূপ চিহ্নিত স্থানে প্রিয় নবি (স.) ওয়াকফ করেছিলেন।

وقف جبرائيل - ওয়াকফ জিবরাইল (আ.)। এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দিলে বরকত লাভ হয়।

وقف غفران - ওয়াক্‌ফ গুফরান। এ স্থানে থামলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।

কাজ : শিক্ষার্থী ওয়াকফের চিহ্নসমূহের একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

নাযিরা তিলাওয়াত

আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত অত্যধিক। পবিত্র কুরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করা যায়। আবার দেখেও পাঠ করা যায়। দেখে দেখে তিলাওয়াত করাকে নাযিরা তিলাওয়াত বলে। নাযিরা তিলাওয়াত একটি উত্তম ইবাদত। আল্লাহ তাআলা এরূপ তিলাওয়াতকারীকে আখিরাতে অত্যধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন। আমরাও বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করব।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

আল-কুরআন অত্যন্ত মর্যাদাবান গ্রন্থ। সুতরাং অত্যন্ত আদবের সাথে এ কিতাব তিলাওয়াত করা উচিত। আল-কুরআন তিলাওয়াতের কতিপয় আদব নিচে দেওয়া হলো-

ক. পূর্ণরূপে ওযু করে পাক-পবিত্র জায়গায় বসা।

খ. পবিত্র কুরআনকে উঁচু কোনো কিছুর উপর রাখা।

গ. মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত করা। কোনোরূপ কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা না করা।

ঘ. ধীরে ধীরে তাজবিদের সাথে তিলাওয়াত করা।

ঙ. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তিলাওয়াত করা।

শ্রেণির কাজ

- এ শ্রেণিতে নাযিরা তিলাওয়াতের পাঠ হলো– সুরা বাকারার পঞ্চম রুকু থেকে অষ্টম রুকু পর্যন্ত।
- শিক্ষক প্রথমে দেখে দেখে শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করবেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা মনোযোগ

সহকারে শুনবে। কোনোরূপ কথাবার্তা, হাসি–তামাশা, হট্টগোল করবে না।

- এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা একেকজন করে তিলাওয়াত করবে। শিক্ষক তা শুনবেন। কারো কোনো ভুল হলে তা সংশোধন করে দেবেন। শিক্ষকের নির্দেশনামত শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভুলগুলো ঠিক করে নেবে।
- অতঃপর শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে পুনরায় তিলাওয়াত করবে এবং শিক্ষক শুনবেন। শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেবেন। এভাবে শিক্ষার্থীরা শুদ্ধরূপে তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শিখবে। অতঃপর বাড়িতে নিয়মিত তিলাওয়াতের অভ্যাস করবে।

অর্থ ও পটভূমিসহ কুরআনের কতিপয় সুরা

পাঠ ৬

সুরা আদিয়াত (سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ)

সুরা আল-আদিয়াত পবিত্র কুরআনের ১০০তম সুরা । এটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এ সুরায় প্রথম শব্দ আল-আদিয়াত। এ শব্দ থেকেই এ সুরার নামকরণ করা হয়েছে। এ সুরার আয়াত সংখ্যা সর্বমোট ১১টি।

শব্দার্থ

وَ	-	শপথ, কসম	كَنُوْدٌ	-	অকৃতজ্ঞ
اَلْعَادِيَاتِ	-	ধাবমান অশ্বরাজি	شَهِيْدٌ	-	সাক্ষী, অবহিত
ضَبْحًا	-	উর্ধ্বশ্বাসে	حُبِّ	-	ভালোবাসা, আসক্তি
فَالْمُوْرِيَاتِ	-	অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণকারী	خَيْرِ	-	ভালো, কল্যাণ, ধন-সম্পদ
قَدْحًا	-	ক্ষুরাঘাতে, ক্ষুরের আঘাতে	شَدِيْدٌ	-	কঠের, কঠিন, প্রবল
اَلْمُغِيْرَاتِ	-	হামলাকারী, আক্রমণকারী, অভিযানকারী	بُعْثِرَ	-	উত্থিত হবে, উঠনো হবে
صُبْحًا	-	প্রত্যুষে, প্রভাতে, প্রভাতকালে	حُصِّلَ	-	প্রকাশ করা হবে
اَثَرْنَ	-	উৎক্ষিপ্ত করে	اَلصُّدُوْرِ	-	অন্তরসমূহ, বক্ষসমূহ
نَقْعًا	-	ধূলি	خَبِيْرٌ	-	অবহিত, সর্বজ্ঞাত
وَسَطْنَ	-	মধ্যে ঢুকে পড়ে			

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۝

১. শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির,

فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۙ

২. যারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে,

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۙ

৩. যারা প্রভাতকালে অভিযান চালায়,

فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۙ

৪. আর সে সময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে;

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۙ

৫. অতঃপর শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়ে,

إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۖ

৬. নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۖ

৭. আর সে এ বিষয়ে অবশ্যই অবহিত,

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۚ

৮. এবং নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত।

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۙ

৯. তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয়,যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে?

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۙ

১০. এবং অন্তরে যা কিছু আছে তা প্রকাশ করা হবে?

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

১১. সেদিন তাঁদের কী হবে, সে সম্পর্কে তাঁদের প্রতিপালক অবশ্যই সবিশেষ অবহিত।

ব্যাখ্যা

এ সুরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পাঁচ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সামরিক অশ্বের নানা গুণ বর্ণনা এবং এগুলোর শপথ করেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা মানুষের দুটি বিশেষ স্বভাব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো-

ক. স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

খ. সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা।

আর মানুষ সেচ্ছায়, সজ্ঞানে এ দুটি কাজ করে থাকে। অথচ এগুলো মানুষের করা একেবারেই অনুচিত।

এ জন্য সুরার শেষ পর্যায়ে মানুষকে আখিরাত ও কবরের জীবনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ কি জানে না যে তাকে কবরে যেতে হবে। অতঃপর কিয়ামতে তাদের সকল কার্যকলাপ প্রকাশ করা হবে। এমনকি সে অন্তরে যেসব অকৃতজ্ঞতা ও লোভ-লালসা পোষণ করত, তাও প্রকাশ করা হবে। পরিশেষে সমস্ত কিছুর বিচার করা হবে। আর সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা খুব ভালোভাবেই অবহিত। সুতরাং মানুষের উচিত সকল অন্যায় ও অকৃতজ্ঞতা ত্যাগ করে সৎপথে জীবনযাপন করা।

শিক্ষা

এ সুরা থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা লাভ করি :

নিঃসন্দেহে মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

ধন-সম্পদের প্রতিও মানুষের আসক্তি প্রবল।

আখিরাতে মানুষের অন্তরের গোপন বিষয়ও প্রকাশ করা হবে।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা মানুষের চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন।

অতএব, আমরা সদাসর্বদা এ সুরার শিক্ষা মনে রাখব। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করব। কখনোই তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হব না। সাথে সাথে ধন-সম্পদের লোভে পড়ে অন্যায় ও অসৎ কাজ করব না। বরং আখিরাতে জবাবদিহি করার কথা স্মরণ রেখে সর্বদা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করব।

কাজ : সুরা আদিয়াতের তিনটি শিক্ষা শিক্ষার্থী খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

সুরা আল্ কারিআহ (سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ)

সুরা আল কারিআহ মক্কি সুরাসমূহের মধ্যে অন্যতম সুরা। এটি পবিত্র কুরআনের ১০১তম সুরা। এর আয়াত সংখ্যা ১১টি।

এ সুরার প্রথম শব্দ আল কারিআহ। কারিআহ অর্থ সজোরে আঘাতকারী। কিয়ামত বা মহাপ্রলয় পৃথিবীকে সজোরে আঘাত করবে বলে একে কারিআহ বলা হয়। এ সুরায় কিয়ামতের নানা অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। এ জন্য এ সুরার নাম রাখা হয়েছে আল কারিআহ বা মহাপ্রলয়।

শব্দার্থ

اَلْقَارِعَةُ	-	মহাপ্রলয়, সজোরে আঘাতকারী	مَوَازِيْنُ	-	পাল্লাসমূহ, পরিমাপ দণ্ডগুলো
يَوْمَ	-	দিন	عِيْشَةٍ	-	জীবন, জীবিকা
اَلْفَرَاشُ	-	পতঙ্গ	رَاضِيَةٍ	-	সন্তোষজনক
اَلْمَبْثُوْثِ	-	বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো-ছিটানো	خَفَّتْ	-	হালকা হবে
اَلْجِبَالُ	-	পর্বতসমূহ	اُمُّ	-	স্থান, জায়গা, ঠিকানা
اَلْعِهْنِ	-	রঙ্গিন পশম	هَاوِيَةٌ	-	হাবিয়া, গভীর গর্ত, এটি একটি জাহান্নামের নাম
اَلْمَنْفُوْشِ	-	ধুনিত	نَارٌ	-	আগুন
ثَقُلَتْ	-	ভারী হবে	حَامِيَةٌ	-	উত্তপ্ত, প্রজ্বলিত, জ্বলন্ত

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلْقَارِعَةُ ۝١

১. মহাপ্রলয়,

مَا الْقَارِعَةُ ۝٢

২. মহাপ্রলয় কী?

وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣

৩. আপনি কি জানেন মহাপ্রলয় কী?

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝

৪. সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো।

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝

৫. আর পর্বতসমূহ ধুনিত রঙিন পশমের মতো হবে।

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝

৬. অতঃপর সেদিন যার পাল্লা ভারী হবে,

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝

৭. সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন।

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝

৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে,

فَأُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝

৯. তার স্থান হবে হাবিয়া।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ۝

১০. আপনি কি জানেন তা কী?

نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

১১. তা অতি উত্তপ্ত আগুন।

ব্যাখ্যা

সূরা আল কারিআহতে আল্লাহ তাআলা দুই ধরনের বিষয় উল্লেখ করেছেন। সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কিয়ামতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করবেন। এ জন্য এ সূরায় তিনি আল-কারিআহ বা মহাপ্রলয় শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সেদিন এ পৃথিবীর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বড় বড় পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত সেদিন ধুনিত পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। মানুষ কীটপতঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আসমান, জমিন, সাগর, নদী, বন-জঙ্গল সবকিছুই সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন শুধু আল্লাহ তাআলা থাকবেন। তিনি ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ সুরায় দ্বিতীয় পর্যায়ে শেষ ৬টি আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার কাজকর্মের পরিণতি বর্ণনা করেছেন। হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষের হিসাবনিকাশ নেওয়া হবে। মানুষের পাপপুণ্য পাল্লায় ওজন করা হবে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি পুণ্য বা নেক কাজ করবে, তার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে। সে লাভ করবে চিরশান্তির জান্নাত। সে সেখানে সন্তুষ্ট চিত্তে বসবাস করবে। অপরদিকে যার পুণ্যের পাল্লা হালকা হবে তার পাপের পাল্লা ভারী হবে। তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হাবিয়া নামক দোযখ হবে তার বাসস্থান। হাবিয়া খুবই গভীর স্থান। এতে রয়েছে উত্তপ্ত আগুন। সেখানে পাপীরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

শিক্ষা:

- এ দুনিয়ার জীবন ও দুনিয়া উভয়ই ক্ষণস্থায়ী।
- মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গোটা দুনিয়া ও সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করে দেবেন।
- হাশরে মানুষের ভালোমন্দের বিচার করা হবে।
- নেককার ব্যক্তির স্থান হবে চিরশান্তির জান্নাত।
- আর পাপীদের ঠিকানা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির জাহান্নাম।

আমরা এ সুরাটি অর্থসহ মুখস্থ করব। এ সুরার শিক্ষা অনুসারে সর্বদা ভালোকাজ করব। অন্যায় ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থী সুরা কারিআহর শিক্ষাগুলো লিখে বাড়ি থেকে একটি পোস্টার তৈরি করে নিয়ে আসবে।

পাঠ ৮

সুরা আত-তাকাসুর (سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ)

এ সুরার প্রথম আয়াতে বর্ণিত তাকাসুর শব্দ থেকে এ সুরার নামকরণ করা হয়েছে সুরা আত-তাকাসুর। এটি পবিত্র কুরআনের ১০২তম সুরা। এটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা ৮টি।

রাসুলুল্লাহ (স.) একদা সাহাবিগণকে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ক্ষমতা কারও নেই যে সে দৈনিক এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে। উত্তরে তারা বললেন, হ্যাঁ এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনেরইবা আছে? অতঃপর রাসুল (স.) বললেন, তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন সুরা তাকাসুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য, প্রতিদিন এই সুরা একবার পাঠ করা এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করার সমান। (মাযহারি)

শানে নুযুল

কুরাইশের শাখাগোত্র ছিল বনু আবদি মানাফ, বনু কুসাই ও বনু সাহম। এদের প্রত্যেক গোত্র অপর গোত্রকে লক্ষ্য করে বলত, কি নেতৃত্ব, কি ক্ষমতা কিংবা জনসংখ্যা সবদিক থেকেই আমরা তোমাদের ওপরে। এতে করে প্রথমে বনু আবদি

মানাফই সবার ওপরে প্রমাণিত হলো। শেষে সবাই বলল, আমাদের মধ্যে যারা মারা গেছে তাঁদেরকেও হিসাব করব। কাজেই তারা কবরস্থানে গিয়ে হাজির হলো এবং কোনটা কার কবর তা বলে বলে গুনতে শুরু করল। এবার বনু সাহমের সংখ্যায় তিন পরিবার বেশি হলো। কেননা জাহিলি যুগে তাঁদের জনসংখ্যা বেশি ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই সুরা নাযিল হয়।

শব্দার্থ

اَلْهٰكُمُ	-	তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করেছে, মোহাবিষ্ট করেছে	لَوْ	-	যদি
التَّكَاثُرُ	-	প্রাচুর্য, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা	عِلْمَ	-	জ্ঞান
حَتّٰى	-	পর্যন্ত, যতক্ষণ না, এমনকি	الْيَقِيْنِ	-	দৃঢ় বিশ্বাস, নিশ্চিত
زُرْتُمُ	-	তোমরা সাক্ষাৎ করেছ, তোমরা উপনীত হয়েছ, তোমরা মুখোমুখি হয়েছ।	اَلْجَحِيْمَ	-	জাহিম, একটি জাহান্নামের নাম
اَلْمَقَابِرَ	-	কবরসমূহ,	عَيْنَ	-	চক্ষু, চোখ
كَلَّا	-	কখনোই না	يَوْمَئِذٍ	-	সেদিন
سَوْفَ	-	অচিরেই, শীঘ্রই	عَنِ	-	হতে, থেকে, সম্পর্কে
تَعْلَمُوْنَ	-	তোমরা জানবে	اَلنَّعِيْمِ	-	নিয়ামত
ثُمَّ	-	অতঃপর, আবার			

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। (এমনকি এ অবস্থায় তোমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যাও)

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣

৩. এটা সঙ্গত নয়, তোমরা অচিরেই তা জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤

৪. আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥

৫. সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝

৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝

৭. আবার বলি, তোমরা তা অবশ্যই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে দেখবে।

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

৮. অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

ব্যাখ্যা

এ সুরায় ধন-সম্পদের মোহ ও প্রতিযোগিতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা ইত্যাদির প্রতি লোভী। প্রাচুর্য লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই মানুষের মৃত্যু এসে যায়। অথচ সে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কোনো প্রস্তুতিই নিতে পারে না। কিন্তু এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা ধন-সম্পদ হলো ক্ষণস্থায়ী বিষয়। এগুলোর প্রতি মোহ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অথচ আখিরাতের সাফল্য ও কল্যাণ এগুলোর তুলনায় কতই না উত্তম। মানুষের উচিত দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া। মানুষ যদি আখিরাতের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করত তবে কখনোই দুনিয়ার প্রাচুর্যের প্রতি আকৃষ্ট হত না।

মৃত্যুর পর মানুষ আখিরাতকে বুঝতে পারবে। আখিরাতের নানা বিষয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবে। অথচ সে তখন কিছুই করতে পারবে না। বরং দুনিয়ায় প্রাপ্ত নিয়ামত সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। দুনিয়ার লোভ-লালসা ও অন্যায়-অনৈতিকতার জন্য সে জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে।

শিক্ষা:

- সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতি মোহাচ্ছন্ন থাকা উচিত নয়।
- এটি মানুষকে আখিরাত ভুলিয়ে দেয়।
- অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ উপার্জনকারী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।
- আখিরাতে সকল কাজের হিসাব নেওয়া হবে।

অতএব, আমরা ধন-সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা করব না। বরং বৈধভাবে প্রয়োজনমত ধন-সম্পদ উপার্জন করব। আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশনামত খরচ করব। অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা করব না।

কাজ :

ক. শিক্ষার্থী সুরা তাকাসুরের শানে নুযুল পাশের বন্ধুকে বলবে।

খ. শিক্ষার্থী সুরা তাকাসুরের শিক্ষাগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ৯

সূরা লাহাব (سُوْرَةُ اللَّهَبِ)

সূরা লাহাব মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ৫টি। এ সুরায় আবু লাহাবের চরিত্র ও পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা লাহাব। এটি আল-কুরআনের ১১১তম সুরা।

শানে নুযুল

একদা রাসুলুল্লাহ (স.) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কুরাইশদের ডাক দিলেন। তৎকালীন সময়ে আরবে বিপদাপদের ক্ষেত্রে এভাবে আহ্বান করার প্রচলন ছিল। তাই রাসুল (স.)–এর ডাকে সকলেই পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হলো। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি যদি বলি যে এ পাহাড়েরর অপর পাশে একটি শত্রুদল তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। যেকোনো সময় তারা তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? সকলেই সমস্বরে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করব। এরপর রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি তোমাদের এক ভীষণ শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি। (তোমরা স্বীকার কর যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ কর।) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর এ দাওয়াত শুনে আবু লাহাব বলে উঠল-

تَبًّا لَّكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا

অর্থ : 'তোমার ধ্বংস হোক। এ জন্যই কি তুমি আমাদের একত্র করেছ?'

অতঃপর আবু লাহাব রাসুল (স.)-কে পাথর মারতে উদ্যত হয়। আবু লাহাবের এ কথা ও কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তাআলা এ সুরা নাযিল করেন। (সহিহ বুখারি)

শব্দার্থ

تَبَّتْ	-	ধ্বংস হোক, বিনষ্ট হোক।	ذَاتَ لَهَبٍ	-	লেলিহান, শিখাযুক্ত
يَدُ	-	হাত	اِمْرَاَتُهٗ	-	তার স্ত্রী
يَدَا	-	দু হাত	حَمَّالَةَ	-	বহনকারিণী
مَآ اَغْنٰى	-	কোনো কাজে আসে নি, কোনো উপকার আসে নি, রক্ষা করে নি	الْحَطَبِ	-	কা, লাকড়ি, ইন্ধন
كَسَبَ	-	সে উপার্জন করেছে	جِيْدِ	-	গলা
سَيَصْلٰى	-	সে অচিরেই প্রবেশ করবে	حَبْلٌ	-	রশি, ফাঁস, রজ্জু
نَارًا	-	আগুন, দোযখ	مَسَدٍ	-	পাকানো, প্যাঁচানো

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝

১. আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।

مَآ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝

২. তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে তা কোনো কাজে আসে নি।

سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝

৩. শীঘ্রই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে।

وَّامۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۝

৪. এবং তার স্ত্রীও (প্রবেশ করবে) যে ইন্ধন বহন করে।

فِىۡ جِيۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ ۝

৫. তার গলায় পাকানো রশি।

ব্যাখ্যা

আবু লাহাব ছিল ইসলাম ও নবি করিম (স.)-এর শত্রু। সে সর্বদাই ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত ছিল। এ সুরায় তার শোচনীয় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। আবু লাহাব ছিল রাসুল (স.)-এর চাচা। মক্কা নগরীতে সে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল।সে প্রচুর ধন-সম্পদেরও মালিক ছিল। কিন্তু এত কিছুও তার কোনো কাজে আসে নি।বরং দুনিয়াতেও আবু লাহাবের ধ্বংস। আর আখিরাতেও সে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।তার স্ত্রীও ছিল তারই মতো ইসলামের শত্রু।সেও রাসুল (স.)-কে কষ্ট দিত। সে রাসুল (স.)–এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। ফলে তার প্রতিও আল্লাহ্ তাআলার অভিশাপ রয়েছে এবং আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

শিক্ষা

- রাসুলুল্লাহ (স.) ও ইসলামের বিরোধিতা খুবই মারাত্মক কাজ।
- এর ফলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের ধ্বংস অনিবার্য।
- দুনিয়ার মানসম্মান, ধন-সম্পদ ইসলামের এসব শত্রুকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

কাজ : শিক্ষার্থী সুরা লাহাবের শিক্ষাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১০

সূরা ইখলাস (سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ)

সূরা ইখলাস আল-কুরআনের ১১২তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৪টি। এ সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এ সূরার ফযিলত অত্যন্ত বেশি। মহানবি (স.) বলেছেন, এই সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)। অন্য একটি হাদিসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসুল (স.)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি এ সূরাটি খুব ভালোবাসি। উত্তরে নবি করিম (স.) বললেন, এর ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (জামি তিরমিযি)

শানে নুযুল

একবার মক্কার মুশরিকরা মহানবি (স.)-এর নিকট আল্লাহ তাআলার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তাআলা এ সূরা নাযিল করেন। (জামি তিরমিযি)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল আল্লাহ তাআলা কিসের তৈরী-স্বর্ণ, রৌপ্য না অন্য কিছুর ? তাদের এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আল্লাহ তাআলা এ সূরা নাযিল করেন।

শব্দার্থ

قُلْ	-	আপনি বলুন, তুমি বল	لَمْ يَلِدْ	-	তিনি কাউকে জন্ম দেন নি
هُوَ	-	তিনি, সে	لَمْ يُوْلَدْ	-	তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি
اَحَدٌ	-	একক, এক-অদ্বিতীয়	كُفُوًا	-	সমতুল্য, সাদৃশ্যপূর্ণ, সমকক্ষ
الصَّمَدُ	-	অমুখাপেক্ষী, বে-নিয়ায, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ং সম্পূর্ণ।			

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ

১. বলুন, (হে নবি!), তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ

২. আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, (সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ

৩. তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

৪. আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

ব্যাখ্যা

এ সুরা তাওহিদ বা একত্ববাদের সুপ্রসিদ্ধ প্রমাণ। এ সুরায় সংক্ষিপ্তরূপে আল্লাহ তাআলার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এতে মুশরিক ও কাফিরদের বিশ্বাসের জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সবকিছু তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন এবং একাই নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। বরং সৃষ্টি জগতের সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। আর তাঁর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনি সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে। তিনি কাউকে জন্ম দেন নিএবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। বিশ্বজগতে তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউই নেই।

শিক্ষা

- আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়।
- তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা–মাতা কেউ নেই।
- তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান।
- তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

আমরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করব। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করব না।

কাজ : শিক্ষার্থী সুরা ইখলাসের শিক্ষাগুলো লিখে একটি রঙিন পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ১১

মুনাজাতমূলক আয়াত

আল্লাহ তাআলা আমাদের রব। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও রক্ষক। তিনি অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি আমাদের আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য ইত্যাদি দান করেন। পৃথিবীর সকল নিয়ামত তাঁরই দান। তিনি আমাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। তাঁর দয়া ও করুণাতেই আমরা দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা পাই। এককথায় সকল কিছু তাঁরই অধীন। তাঁর হুকুমেই সবকিছু পরিচালিত হয়। পার্থিব জীবনে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন,তাও তিনি দান করেন।

সুতরাং আমাদের উচিত তাঁরই কাছে সব কিছুর জন্য প্রার্থনা করা। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রার্থনা করে না,আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হন।' (জামি তিরমিযি)। আল্লাহ তাআলার নিকট কিছু চাওয়ার

মাধ্যম হলো মুনাজাত করা। মুনাজাতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের চাহিদা জানাতে পারি। আল-কুরআনে মুনাজাতমূলক বহু আয়াত রয়েছে। এ পাঠে আমরা এরূপ তিনটি মুনাজাতমূলক আয়াত শিখব। অতঃপর এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট মুনাজাত করব।

আয়াত -

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' (সুরা আল-আরাফ, আয়াত ২৩)

সর্বপ্রথম এ মুনাজাত হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করে জান্নাতে বসবাস করতে নির্দেশ দেন। জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সকল নিয়ামত ভোগ করার অনুমতি দেন। শুধু একটি নির্দিষ্ট গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেন। কিন্তু আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) শয়তানের প্ররোচনায় ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। তাঁদের এ কাজের জন্য মহান আল্লাহ বেহেশত থেকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। দুনিয়ায় এসে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন। তাঁরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে কান্নাকাটি করতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের উপর্যুক্ত মুনাজাত শিক্ষা দেন। অতঃপর হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এ মুনাজাতের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁদের দোয়া কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন।

এ আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুনাজাত। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমরা নানা রকম পাপ করে থাকি। আমরা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে থাকি। এমতাবস্থায় আমাদের উচিত অপরাধসমূহ স্বীকার করা। অতঃপর এ মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি দয়া করবেন এবং আমাদের পাপ মাফ করে দেবেন।

আয়াত–২

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ○

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ থেকে আমাদের প্রতি দয়া কর এবং আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা কর। (সুরা কাহফ, আয়াত ১০)

মুনাজাতটি আসহাবে কাহফের যুবকগণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা সুরা কাহফে তাঁদের ঘটনা ও মুনাজাত উল্লেখ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.)-এর আগমনের কয়েকশ বছর পূর্বের ঘটনা। দাকইয়ানুস নামক এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিল। সে ইমানদারদের ওপর খুব অত্যাচার করত। তার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েকজন যুবক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। তাঁদের সাথে একটি কুকুরও ছিল। তাঁদেরকে আসহাবে কাহফ বলা হয়। তাঁরা গুহাতে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। গুহায় থাকাবস্থায় তাঁরা আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করে এ মুনাজাত করেন। আল্লাহ তাআলাও তাঁদের দোয়া কবুল করেন।

নেককার ও পুণ্যবানগণ কখনোই আল্লাহ তাআলার ইবাদত ত্যাগ করেন না। শত অত্যাচারেও তাঁরা যথাযথভাবে মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন। এ জন্য প্রয়োজনে নিজেদের ঘরবাড়ি, দেশত্যাগ করতেও পিছপা হন না। আমরাও তাঁদের মতো আল্লাহ তাআলার ইবাদত করব। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলার ইবাদত ছাড়ব না। বরং কোনো অসুবিধা দেখা দিলে আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব। ফলে তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং আমাদের সকল কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবেন।

আয়াত–৩

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই ওপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।' (সুরা মুমতাহিনা, আয়াত ৪)

এ মুনাজাত করেছিলেন হযরত ইবরাহিম (আ.)। কাফিরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট এ মুনাজাত করেন।

বস্তুত,আল্লাহ তাআলা সকল কিছুর মালিক। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত আমরা কোনো কিছু করতে পারব না। সুতরাং সুখ-দু:খ, আনন্দ-বেদনা সকল অবস্থায় আমরা আল্লাহ তাআলার দয়ার ওপর নির্ভর করব। সকল কাজে তাঁরই অভিমুখী হব। তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের সাহায্য করবেন। উক্ত মুনাজাত আমাদের এ শিক্ষা প্রদান করে।

কাজ :

ক. শিক্ষার্থীরা মুনাজাতমূলক আয়াত তিনটি অর্থসহ একে অন্যকে মুখস্থ বলবে।

খ. শিক্ষার্থী মুনাজাতমূলক আয়াত তিনটি পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখার জন্য সুন্দর করে লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ১২

হাদিস শরিফ (اَلْحَدِيْثُ)

হাদিস আরবি শব্দ। এর অর্থ কথা, বাণী ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে হাদিস বলা হয়।

হাদিসের গুরুত্ব

মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতেন। হাতে-কলমে পুণ্য ও ন্যায় কাজের শিক্ষা দিতেন। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির আদর্শ। আমাদের প্রিয় নবি হযরত

মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তাঁর পর আর কোনো নবি আসবেন না। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শই কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষ অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং তাঁর সকল কথা ও কর্ম সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। এগুলো জানার মাধ্যমেই আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারি। হাদিস শরিফ হলো নবি করিম (স.)-এর জীবনের সকল কাজ কর্মের সংরক্ষক। এর মাধ্যমেই আমরা মহানবি (স.)-এর সকল নির্দেশনা ও শিক্ষা জানতে পারি।

যদি হাদিস শরিফ না থাকত,তবে আমরা এসব কিছু জানতে পারতাম না। সুতরাং পুণ্য ও ন্যায়ের পথে চলার জন্য হাদিস শরিফের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

হাদিস ইসলামি জীবনব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস। আল-কুরআনের পরই হাদিসের স্থান। হাদিস আল-কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা বহু নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মহানবি (স.) সেগুলো আমাদের সামনে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সেসব বিধান সাহাবিগণকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। হাদিস জানার মাধ্যমেই আমরা এগুলো জানতে পারি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

অর্থ : 'রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।' (সুরা হাশর, আয়াত ৭)

আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে হাদিসের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। অতএব, আমরা হাদিস শরিফ জানব এবং সে অনুযায়ী যথাযথভাবে আমল করতে চেষ্টা করব।

সিহাহ সিত্তাহ (اَلصِّحَاحُ السِّتَّةُ)

সিহাহ শব্দের অর্থ শুদ্ধ, সঠিক। আর সিত্তাহ শব্দের অর্থ ছয়। বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সহিহ হাদিসসমূহ এ ছয়টি গ্রন্থে একত্র করা হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে আমরা নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে মহানবি (স.)-এর হাদিসসমূহ জানতে পারি।

নিম্নে আমরা উক্ত ছয়টি হাদিস গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানব :

১. সহিহ বুখারি

এ গ্রন্থের সংকলক হলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারি (র.)। তিনি ইমাম বুখারি নামে খ্যাত। তাঁর নামানুসারেই তাঁর সংকলিত কিতাবকে সহিহ বুখারি বলা হয়। তিনি সর্বমোট ছয় লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর কিতাব সংকলন করেন। এটি ৩০ পারায় বিভক্ত। সহিহ বুখারি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ। বলা হয়, কুরআন মাজিদের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো সহিহ বুখারি।

২. সহিহ মুসলিম

এটি সিহাহ সিত্তাহর দ্বিতীয় গ্রন্থ। বিশুদ্ধতার দিক থেকে সহিহ বুখারির পরই এর স্থান। এ গ্রন্থের সংকলক হলেন আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশাইরি (র.)। তিনি তিন লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে এ কিতাব সংকলন করেন।

৩. জামি তিরমিযি

এ কিতাবের সংকলক আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযি (র.)। এ কিতাবে প্রায় সব বিষয়ের হাদিস সংকলন করা হয়েছে। এ কিতাব সম্পর্কে বলা হয়- 'যার ঘরে এ কিতাব থাকবে, মনে করা যাবে যে তার ঘরে নবি করিম (স.) আছেন এবং তিনি নিজে কথা বলছেন।'

৪. সুনানে আবু দাউদ

এ কিতাবের সংকলকের নাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশআছ (র.)। এ কিতাবের বিন্যাসপদ্ধতি অত্যন্ত উন্নতমানের। সর্বমোট ৫ লক্ষ হাদিস যাচাই-বাছাই করে এ কিতাব সংকলন করা হয়।

৫. সুনানে নাসাই

এর সংকলক আহমদ ইবন শুআইব আন-নাসাই (র.)। এর বিন্যাসপদ্ধতি উঁচুমানের। সিহাহ সিত্তাহের মধ্যে এ কিতাব খানার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

৬. সুনানে ইবন মাজাহ

এটি সিহাহ সিত্তাহের সর্বশেষ কিতাব। এর সংকলকের নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ।

আমরা বড় হয়ে হাদিসের এসব কিতাব পড়ব। এগুলো থেকে প্রিয় নবি (স.)-এর বাণী ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করব। অতঃপর এগুলোর শিক্ষা অনুসারে স্বীয় জীবন পরিচালনা করব।

কাজ : শিক্ষার্থী ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ ও এগুলোর সংকলকগণের নাম নিজ খাতায় লিখে একটি চার্ট তৈরি করবে।

পাঠ ১৩

মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস

মুনাজাত হলো আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করা। মুনাজাত করার দ্বারা আল্লাহ তাআলার মহানত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা যে ব্যক্তি দুর্বল, অসহায় সে-ই সাধারণত সাহায্য চায়। আর সাহায্যকারী স্বভাবতই ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। মহান আল্লাহর নিকট মুনাজাতের মাধ্যমে আমরা আমাদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করি। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার অমুখাপেক্ষিতা, ক্ষমতা, দয়া ইত্যাদি গুণের স্বীকৃতি প্রদান করি। সুতরাং মুনাজাতও একপ্রকার ইবাদত। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা খুশি হন। হাদিস শরিফে মুনাজাতমূলক বহু হাদিস রয়েছে। নিম্নে আমরা মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস জানব।

হাদিস–১

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰی وَالتُّقٰی وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰی -

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত (সরল সঠিক পথের নির্দেশনা), তাকওয়া বা পরহেযগারি, পবিত্রতা ও অভাব-অনটন থেকে মুক্তি কামনা করছি।' (সহিহ মুসলিম ও জামি তিরমিযি)

হাদিস–২

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ وَاهْدِنِیْ وَعَافِنِیْ وَارْزُقْنِیْ -

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, আমাকে নিরাপদে রাখ এবং আমাকে রিযিক দান কর।' (সহিহ মুসলিম)

হাদিস–৩

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِیْ عَلٰی دِیْنِكَ -

অর্থ : 'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দীনের (ইসলামের) ওপর দৃঢ় রাখ।' (জামি তিরমিযি)

দীনের ওপর দৃঢ়-স্থির থাকা মুমিনের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। উল্লিখিত হাদিসে আল্লাহ তাআলার নিকট এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

আমরা উপরিউক্ত মুনাজাতসমূহ শিখব। এগুলোর অর্থ জানব। অতঃপর এগুলোর দ্বারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করব। তাহলে আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন। আমাদের ক্ষমা করবেন এবং দয়া করবেন। এভাবে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিসের অর্থ একটি পোস্টারে লিখবে এবং শ্রেণীতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৪

মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতামূলক তিনটি হাদিস

মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতা দুটি মহৎ গুণ। আমাদের সমাজে নানারকম লোকজন বসবাস করে। ধনী-গরিব, সাদা-কালো, সুস্থ-অসুস্থ, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবরকমের লোকদের নিয়েই আমাদের সমাজ। সবাই এ সমাজের সদস্য। সবাই মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সবার মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা না থাকলে কোনো সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। আর এর জন্য প্রয়োজন মানুষের প্রতি প্রীতি, দয়া-মায়া, ভালোবাসা। ইসলাম ধর্মে

এগুলোর প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আমাদের মহানবি (স.) নিজে সকল মানুষকে ভালোবাসতেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত সবাইকেই তিনি ভালোবাসতেন, সবার প্রতি দয়া করতেন। আমাদের তিনি এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিস শরিফে আমরা তাঁর এসব নির্দেশ দেখতে পাই।

আমাদের সমাজে মুসলমানগণের পাশাপাশি অমুসলিমগণও বসবাস করে। তারাও আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তাঁদের প্রতিও সদাচরণ করতে হবে। তাঁদের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি কোনোরূপ ঠাট্টা-তামাশা করা যাবে না। তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করতে দিতে হবে। এটাই হলো মহানবি (স.) ও দীন ইসলামের শিক্ষা। হাদিস শরিফে এ সম্পর্কেও আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ পাঠে আমরা মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতা-সংক্রান্ত তিনটি হাদিস জানব।

হাদিস–১

لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ -

অর্থ : 'যে মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি দয়া করেন না।' (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

শিক্ষা

পৃথিবীর সকল মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি। সকলের প্রতিই সদাচার করতে হবে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি দয়া-মায়া, ভালোবাসা দেখাতে হবে। এমন যেন না হয় যে আমরা শুধু ধনীদের ভালোবাসব, গরিবদের ভালোবাসব না। তদ্রূপ অমুসলিমদেরকে বাদ দিয়ে শুধু মুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও ঠিক নয়। বরং প্রয়োজন অনুসারে সকলের প্রতিই দয়া, ভালোবাসা ও সহযোগিতা করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন এবং আমাদের প্রতি দয়া করবেন। সকল মানুষকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করাই এ হাদিসের শিক্ষা।

হাদিস–২

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ -

অর্থ : 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (সহিত বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

শিক্ষা

আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। মা-বাবা, ভাই-বোন, খালা-খালু, ফুফু-ফুফা, দাদা-দাদি, নানা-নানি সকলেই আমাদের আত্মীয়। তারা আমাদের একান্ত আপনজন। এ ছাড়া আমাদের আরও বহু আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। সকলের সাথেই আমরা সম্পর্ক রক্ষা করে চলব। কারো সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন করব না।

আত্মীয়-পরিজন যদি অমুসলিমও হন তাঁদের সাথেও সম্পর্ক ত্যাগ করা যাবে না। বরং তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। সদাচার করতে হবে। প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। বিপদে-আপদে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমরা সকল আত্মীয়ের সাথে সুন্দর সম্পর্ক রাখব। তবেই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।

হাদিস–৩

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

অর্থ : 'সাবধান! কেউ যদি কোনো যিম্মির প্রতি যুলুম করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা ক্ষমতাবহির্ভূত কোনো কাজ তার ওপর চাপিয়ে দেয় বা জোরপূর্বক তার থেকে কোনো মালামাল নিয়ে যায়,তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার (যিম্মির) পক্ষ অবলম্বন করব।' (আবু দাউদ)

শিক্ষা

মুসলিম-অমুসলিম সকলেই এদেশের নাগরিক। মুসলিম অমুসলিমগণের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়-অত্যাচার করা যাবে না। তাঁদের ধর্ম, জীবন, ধন-সম্পদ, সম্ভ্রম ইত্যাদির ক্ষতি করা যাবে না। শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মপালনে তাঁদের কোনোরূপ বাধা দেওয়া যাবে না। তাঁদের ধর্ম নিয়ে কোনোরূপ অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না। তাঁদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। তাঁদের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে। কেননা তাঁদের প্রতি অত্যাচার করলে, তাঁদের কষ্ট দিলে স্বয়ং নবি করিম (স.) কিয়ামতের দিন আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবেন না। আর মহানবি (স.) কারো পক্ষে সুপারিশ না করলে তার ধ্বংস তো অনিবার্য। সুতরাং আমরা সকল মানুষকে ভালোবাসব। কাউকে কষ্ট দেব না, কারো প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন করব না। সমাজের সকলকে ধর্ম পরিচয়ে নয়, মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে সকলের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখব।

কাজ : শিক্ষার্থী এ পাঠে উদ্ধৃত হাদিস তিনটি অর্থসহ মুখস্থ বলবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. জামিউল কুরআন অর্থ .....।

২. দেখে দেখে তিলাওয়াত করাকে ..... তিলাওয়াত বলে।

৩. মৃত্যুর পর মানুষ ..... বুঝতে পারবে।

৪. আবু লাহাব ছিল ..... ও ..... এর শত্রু।

৫. মুসলিমদের ন্যায় অমুসলিমগণও .....।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. একত্ববাদের প্রমাণ	সুরা আদিয়াত
২. আল–কুরআনের ১০০তম সুরা	হযরত উসমান (রা)
৩. স্থগিত রাখা	ওয়াক্‌ফ
৪. মাদ্দে আসলি	হযরত উমর (রা)–এর
৫. আল–কুরআন সংকলনের পরামর্শ	সুরা ইখলাস
	মূল মাদ্দ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তাজবিদ কাকে বলে?

২. নাযিরা তলাওয়াত বলতে কী বুঝ?

৩. সিহাহ সিত্তাহ কাকে বলে?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক. হাদিস কাকে বলে? হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

খ. কুরআন মাজিদ সংকলনের ইতিহাস বর্ণনা কর।

গ. সুরা ইখলাসের শানে নুযুল ও শিক্ষা বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন–

১. মাদ্দের হরফ কয়টি?

ক. ৩টি খ. ৬টি

গ. ১৪টি ঘ. ১৫টি

২. তোমরা কুরআন পাঠ কর, কেননা উহা পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে। হাদিসের উদ্দেশ্য-

i. কুরআন পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা করা

ii. তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত করা

iii. নিজে কুরআন শিক্ষা করা ও অপরকে শেখানো

কোনোটি সঠিক?

১. i ২. ii

৩. i ও ii ৪. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

এরফান নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করে কিন্তু তার তিলাওয়াত শুদ্ধ হয় না। একবার نُوْحٌ (নুহুন) শব্দ তিলাওয়াতের সময়ে ںْ (নুন) বর্ণকে টেনে পড়ে নি।

৩. এরফান এক্ষেত্রে কী ত্যাগ করেছে?

ক. ওয়াক্‌ফ খ. মাদ্দ

গ. মাখরাজ ঘ. সিফাত

৪. এরফান এ জাতীয় তিলাওয়াতে –

i. সালাত শুদ্ধ হবে না

ii. অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে

iii. গুনাহ হবে

কোনোটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নাবিহা প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করে। মেয়ের তিলাওয়াত শোনার জন্য বাবা মাওলানা আহমাদ সাহেব নাবিহার কাছে বসলেন। নাবিহা তিলাওয়াত শুরু করল। এবার তিলাওয়াতের সময়ে ۘ (মিম) চিহ্নে বিরতি দেয় নি, فِيْهَا (ফিহা) তিলাওয়াতের সময়ে ف বর্ণ এবং ه বর্ণ দীর্ঘ করে পড়ে নি। মেয়েকে উদ্দেশ করে নাবিহার বাবা বললেন, কুরআন মাজিদ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ।এর সংরক্ষণ ও সংকলন নির্ভুল ও সন্দেহাতীত পন্থায় হয়েছে। তাই এর তিলাওয়াতও নির্ভুল হওয়া আবশ্যক।

ক. 'মাখরাজ' শব্দের অর্থ কী?

খ. তাজবিদ বলতে কী বোঝায়?

গ. নাবিহা দ্বিতীয় পর্যায়ে কোন বিষয়টি ত্যাগ করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাওলানা আহমাদ সাহেব মেয়ে নাবিহাকে যে বিষয়টির প্রতি তাগিদ দিয়েছেন তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২। আকরাম সাহেব একজন বিশিষ্ট সমাজপতি। একদিন তাঁর অসুস্থ প্রতিবেশী মনির মিয়া চিকিৎসার জন্য কিছু সাহায্য চাইলে তিনি তাকে তাড়িয়ে দেন। অপরদিকে আকরাম সাহেবের বন্ধু আফজাল সাহেব তার অসহায় ফুফার মেয়ের বিবাহের যাবতীয় খরচ বহন করেন।

ক. বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ কয়টি?

খ. 'মানবপ্রেম একটি মহৎগুণ'–ব্যাখ্যা কর।

গ. সাহায্যপ্রার্থী মনির মিয়ার প্রতি আকরাম সাহেবের আচরণে কী লজ্জিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'আফজাল সাহেব তাঁর কাজের জন্য জান্নাত লাভ করতে পারেন' – বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক (اَلْاَخْلَاقُ)

আখলাক আরবি শব্দ। এর অর্থ চরিত্র, স্বভাব, আচার-আচরণ, ব্যবহার ইত্যাদি। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব আচার, ব্যবহার, চালচলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায়, সেসবের সমষ্টিই হলো আখলাক। এককথায় মানবচরিত্রের সব দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। মানবচরিত্রের সৎ ও অসৎ দিকগুলোর বিচারে আখলাককে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। আখলাকে হামিদাহ (প্রশংসনীয় আচরণ) এবং আখলাকে জামিমা (নিন্দনীয় আচরণ)

এই অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থী -

সদাচরণের ধারণা ও কতিপয় সদাচরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

অসদাচরণের ধারণা ও এর কুফল বর্ণনা করতে পারবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে ইভ টিজিং ও ছিনতাইয়ের (রাহাজানি)- নেতিবাচক প্রভাব এবং প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ ০১

আখলাকে হামিদাহ (اَلْاَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ)

মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব উত্তম আচার, ব্যবহার, চালচলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায়, সেসবের সমষ্টিকে আখলাকে হামিদাহ বা উত্তম চরিত্র বলা হয়। যেমন- পরোপকারিতা, শালীনতাবোধ, সৃষ্টির সেবা, আমানত রক্ষা, শ্রমের মর্যাদা, ক্ষমা ইত্যাদি।

আখলাকে হামিদাহর গুরুত্ব

মানবজীবনে আখলাকে হামিদাহর (উত্তম চরিত্রের) গুরুত্ব অপরিসীম। মানবজীবনের সুখ-শান্তি আখলাকে হামিদাহ বা প্রশংসনীয় আচরণের ওপর নির্ভরশীল। প্রশংসনীয় আচরণের মাধ্যমেই উত্তম চরিত্র গড়ে ওঠে। আখিরাতের সুখ-দুঃখও আখলাকে হামিদাহর ওপর নির্ভর করে। যার স্বভাব-চরিত্র যত সুন্দর হবে, সে ততই সৎকর্মশীল হবে এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় হবে।

আখলাকে হামিদার সুফল

১. মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসা লাভ

উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয়, যার চরিত্র সর্বোত্তম।' (বুখারি ও মুসলিম)

২. ইমানের পূর্ণতা অর্জন

উত্তম চরিত্র মানুষের ইমানকে পূর্ণতা দান করে। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا -

অর্থ : 'পূর্ণ মুমিন তাঁরাই,যাদের চরিত্র মহান ও সুন্দরতম।' (আবু দাউদ)

৩. সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)–এর নিকট উঁচু মর্যাদা লাভ করেন এবং সমাজের নিকটও উঁচু মর্যাদার অধিকারী হন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ,যার চরিত্র উত্তম।' (বুখারি)

৪. জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ

মহান আল্লাহ উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই দেবেন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, "আল্লাহ তাআলা যার গঠন ও স্বভাব সুন্দর করেছেন,দোযখের অগ্নি তাকে ভক্ষণ করবে না।' (তাবারানি ও বায়হাকি)

কাজ: শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সদাচরণের একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ২

পরোপকার (اَلْإِحْسَانُ)

মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। আর সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হলে একে অপরের সহযোগিতার প্রয়োজন। অন্যের প্রয়োজনে বা উপকারে আসার নামই হলো পরোপকার।

পরোপকারের আরবি প্রতি শব্দ হলো 'ইহসান' اَلْإِحْسَانُ,যার অর্থ অন্যের উপকার করা। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সেগুলোকে উত্তম বা যথাযথভাবে পালন করার নামই পরোপকার।

তাৎপর্য

পরোপকার মহান আল্লাহর একটি বড় গুণ। মহান আল্লাহ পরম দয়ালু। সমগ্র সৃষ্টির প্রতি তাঁর এ অসীম দয়া ও করুণা বিরাজমান। তিনি সকল মানুষকে সমান যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে সৃষ্টি করেননি। এ কারণে মানুষ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। তাই মানুষ সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী অপরের উপকার করতে হবে।

পরোপকারের সুফল

১. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ

পরোপকারী ব্যক্তিদের আল্লাহ তা আলা ভালোবাসেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

অর্থ : 'তোমরা সৎকর্ম ও পরোপকার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীল ও পরোপকারীদেরকে ভালোবাসেন।' (সুরা বাকারা, আয়াত -১৯৫)

২. সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়

পরোপকারের মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পদ ব্যয় করে বা ভালো কথা বলেও মানুষের উপকার করা যায়। এতে সমাজ থেকে ঝগড়া-ফ্যাসাদ দূর হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. শত্রু মিত্রে পরিণত হয়

পরম শত্রুকেও পরোপকারের মাধ্যমে আপন করা যায়। কঠোর হৃদয়বিশিষ্ট লোকের অন্তরকেও জয় করা যায়।

৪. আল্লাহর রহমত লাভ

আল্লাহর কোনো সৃষ্টির প্রতি দয়া করলে তিনি দয়াকারী ব্যক্তির ওপর রহমত বর্ষণ করেন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর হাদিস –

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَآءِ -

অর্থ : 'তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (তিরমিযি)

৫. মানুষের ভালোবাসা অর্জন

দয়া বা পরোপকারের মাধ্যমে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক বন্ধন মজবুত হয়। কঠিন হৃদয়ের মানুষকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। পরম শত্রুও মিত্রতে পরিণত হয়।

আমরা সর্বদা সৃষ্টির সেবা করব। বিপদে-আপদে অপরের সাহায্য করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে মানুষকে কীভাবে উপকার করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৩

শালীনতাবোধ (اَلتَّهْذِيْبُ)

শালীনতার আরবি প্রতিশব্দ 'তাহযিব' (اَلتَّهْذِيْبُ), যার অর্থ ভদ্রতা, নম্রতা ও লজ্জাশীলতা। আচার-আচরণে, কথাবার্তায়, বেশভূষায় ও চালচলনে মার্জিত পন্থা অবলম্বন করাকে শালীনতা বলে।

গুরুত্ব

শালীনতা মানুষের একটি মহৎগুণ। এটির গুরুত্ব অপরিসীম। শালীনতাবোধ মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। শালীনতা আল্লাহর অনুগত বান্দা হতে সাহায্য করে।আচার-ব্যবহারে শালীন ব্যক্তিকে সবাই পছন্দ করে। শালীন পোশাক পরিচ্ছদ সৌন্দর্যের প্রতীক। শালীন ও ভদ্র আচরণের মাধ্যমে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখতে শালীনতার প্রয়োজন সর্বাধিক। শালীনতাপূর্ণ আচার-ব্যবহার সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের চাবিকাঠি।

অশোভন বা অশালীন পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণ অনেক সময় সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে, সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে। নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায়।

শালীনতাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। পক্ষান্তরে অভদ্র বা অশালীন আচরণ বন্ধুকেও দূরে ঠেলে দেয়। মানুষ অশালীন ব্যক্তিকে পছন্দ করে না। তার সাহচর্য পরিত্যাগ করে। মহানবি (স.) বলেন, 'মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট,যার অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে।' (বুখারি)

অশালীন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা আলা কখনই পছন্দ করেন না। বরং অশালীন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা আলা ঘৃণা করেন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর বাণী–

إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ -

অর্থ : 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা আলা অশালীন ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।' (তিরমিযি)

শালীনতা মানুষের জীবনে অপরিহার্য বিষয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে শালীনতা শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের সুরা লুকমানে উল্লেখ আছে যে, হযরত লুকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে শালীনতা শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন,

'হে পুত্র,অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না।পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যভাবে চলো না, কারণ আল্লাহ কোনো ঔদ্ধত্য অহংকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। তুমি পদচারণ করবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বর সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।' (সুরা লুকমান, আয়াত-১৯)

শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শালীনতা অবলম্বন করে চলা উচিত। এতে জীবন সুন্দর ও মধুময় হয়ে ওঠে। সমাজেও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

কাজ: শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে শালীন আচরণের সুফলগুলো পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

সৃষ্টির সেবা (خِدْمَةُ الْخَلْقِ)

ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতিশীল হয়ে আদর-যত্ন করার নামই হলো সৃষ্টির সেবা। মহান আল্লাহ এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা করে পাঠিয়েছেন। আর সৃষ্টিকুলের সবকিছু যেমন- জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ,পাহাড়-পর্বত,গাছপালা ইত্যাদি মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এসব সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং এগুলোর যত্নও রক্ষণাবেক্ষণ করা অবশ্যকর্তব্য।

গুরুত্ব

যে সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে, আল্লাহ তার প্রতি খুশি হয়ে রহমত বর্ষণ করেন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَآءِ -

অর্থ : 'তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (তিরমিযি)

পৃথিবী ও এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর সৃষ্টি। সৃষ্টি জগতের সবকিছু নিয়ে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবার। আল্লাহর সৃষ্টি পরিবারে মানুষই সেরা সৃষ্টি। পরিবারে যেমন পরিবার প্রধানের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে, তেমনি সৃষ্টি জগতের প্রতিও মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সৃষ্টিকুলের প্রতি এ দায়িত্ব পালন করার নাম সৃষ্টির সেবা।

মানুষের ওপর প্রধানত দুই ধরনের কর্তব্য রয়েছে। প্রথমত স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য, তারপর সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য। সৃষ্টির প্রতি মানুষের কর্তব্যগুলোর মধ্যে অসহায় ও দুস্থ মানুষকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা যেমন কর্তব্য, তেমনি গাছপালা, পশুপাখি, বৃক্ষলতা এবং পরিবেশের প্রতিও মানুষের কর্তব্য রয়েছে। সৃষ্টির প্রতি সদয় হলে এবং এদের লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করলে আল্লাহ খুশি হন। তেমনি এদের প্রতি অবহেলো করলে, নিষ্ঠুর আচরণ করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর হাদিস হলো–

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ- فَاَحَبُّ الْخَلْقِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ -

অর্থ : 'সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর পরিবার, আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই প্রিয়, যে তার পরিবারের প্রতি বেশি অনুগ্রহ করেন।' (মিশকাত)

আমাদের চার পাশের কীটপতঙ্গ, গাছপালা, তরুলতা, পশুপাখি সবকিছুর প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কারণ এ সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। আমাদের স্বার্থেই এ পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। মহান আল্লাহ এ সবকিছু আমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.) সৃষ্টিজীবের প্রতি সর্বদা সদয় ছিলেন।

সমাজে কোনো ব্যক্তি পীড়িত হলে তার সেবা করতে হবে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে সমাজে একে অপরের সেবা ও সাহায্য করলে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া যায়। প্রিয় নবি (স.) বলেছেন, 'যে মুসলমান অন্য মুসলমান ভাইয়ের অভাব মোচন করে আল্লাহ তা আলা তার অভাব দূর করেন।' (মুসলিম)

গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি সকল প্রাণীরই আমাদের ন্যায় ক্ষুধা ও পিপাসা আছে। এদেরকে খেতে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

মহানবি (স.) বলেন, 'কোনো এক মহিলা একটি বিড়াল বেঁধে রাখে। সে বিড়ালটিকে খেতে দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি বাধা অবস্থায় খাদ্যাভাবে মারা গেলে আল্লাহ ঐ মহিলাকে শাস্তি দেন (বুখারি ও মুসলিম)'।

প্রিয় নবি (স.) আরও বলেন- 'বনি ইসরাইলের এক পাপী মহিলা একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পিপাসায় কাতর দেখে পানি পান করায়। এতে আল্লাহ্ তা আলা ঐ মহিলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন' । (বুখারী ও মুসলিম)

জীবজন্তুর মতো উদ্ভিদের প্রতিও সদয় হতে হবে। অকারণে গাছ কাটা উচিত নয়। গাছের পাতা ছেঁড়া বা চারাগাছ উপড়ে ফেলাও উচিত নয়। গাছপালার যত্ন করা উচিত। বৃক্ষলতাও মহান আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে। পরিবেশ রক্ষায় ও নিজেদের প্রয়োজনে জীবজগৎ ও পরিবেশের প্রতি সদাচরণ করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আমরা সৃষ্টির সেবা করব, জীবজন্তুকে কষ্ট দেব না। অকারণে কোনো বৃক্ষের ক্ষতি করব না। বৃক্ষরোপণ করব এবং এর যত্ন করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সৃষ্টির সেবামূলক কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

আমানত (اَلْاَمَانَةُ)

আমানত অর্থ গচ্ছিত রাখা বা দায়িত্বে রাখা। গচ্ছিত বা দায়িত্বে রাখা বস্তু সযত্নে রেখে এর মালিকের কাছে যথাযথভাবে ফেরত দেওয়াকে আমানত রক্ষা বলে। যিনি আমানত রক্ষা করেন, তাকে আমানতদার বলে। আমানতের মাল নষ্ট করা বা আত্মসাৎ করার নাম খিয়ানত করা। আর আত্মসাৎকারীকে খিয়ানতকারী বলে।

গুরুত্ব

সমাজের প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ দায়িত্ব তার নিকট পবিত্র আমানত। সামাজিক শান্তি রক্ষার জন্য আমানত রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যিনি আমানত রক্ষা করেন, তাকে সবাই বিশ্বাস করে এবং ভালোবাসে। সমাজের সবাই তাকে মর্যাদা দেয়। আমানতের খেয়ানতকারীকে সমাজের কেউ পছন্দ করে না এবং বিশ্বাসও করে না। বরং তাকে সবাই ঘৃণা করে। আমানত রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا ۙ

অর্থ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা যেন আমানতসমূহ তার মালিককে যথাযথভাবে ফেরত দাও।' (সুরা আননিসা, আয়াত ৫৮)

আমানত রক্ষা করা ইমানের অঙ্গ। এ ব্যাপারে মহানবি (স.) বলেন,

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهٗ -

অর্থ : 'যার আমানতদারি নেই, তার ইমানও নেই।' (বায়হাকি)

আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ।

মহানবি (স.) বলেন,

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُوتُمِنَ خَانَ -

অর্থ : 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, আমানতের খেয়ানত করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

আমানতের খেয়ানতকারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ঘৃণিত। মানুষের কাছেও ঘৃণিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার বাণী,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۝

অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ খেয়ানতকারীকে পছন্দ করেন না।' (সুরা আনফাল, আয়াত ৫৮)

কাজ: শিক্ষার্থীরা গ্রুপভিত্তিক আলোচনা করে আমানত রক্ষার কয়েকটি ক্ষেত্রের তালিকা প্রস্তুত করবে।

পাঠ ৬

শ্রমের মর্যাদা (شَرَفُ الْعَمَلِ)

মানুষ জীবনধারণের জন্য যেসব কাজ করে,তাকে শ্রম বলে। মানুষ তার নিজের বেঁচে থাকার, অপরের কল্যাণের এবং সৃষ্টি জীবের উপকারের জন্য যে কাজ করে তা-ই শ্রম। মানুষের উন্নতির চাবিকাঠিই হলো শ্রম। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশি উন্নত। শ্রমের ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন,

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

অর্থ : 'অতঃপর যখন নামায শেষ হবে তখন তোমরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড় এবং রিযিক অন্বেষণ কর।' (সুরা জুমা, আয়াত ১০)

শ্রমের মর্যাদা :

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অত্যধিক। শ্রম দ্বারা অর্জিত খাদ্যকে ইসলাম উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন এবং জীবিকা অন্বেষণকে ইবাদত হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ -

অর্থ : 'ফরয ইবাদতের পর হালাল রুজি উপার্জন করা একটি ফরয ইবাদত।' (বায়হাকি)

মানুষের কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ এ পৃথিবীতে অফুরন্ত সম্পদ রেখেছেন। এ সম্পদগুলো আহরণ করতে হলে প্রয়োজন হয় শ্রমের। শ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোও আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টিগতভাবেই দান করেছেন। এগুলো হচ্ছে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা হাত, পা ও মস্তিষ্ক। এগুলোকে কাজে লাগাতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা আলা বলেন- 'তিনি তো তোমাদের জন্য ভূমি সুগম করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার দেওয়া রিযিক থেকে আহার কর।' (সুরা মুলক, আয়াত ১৫)

আমাদের প্রিয় নবি (স.) শ্রমকে ভালোবাসতেন। তিনি নিজেও শ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি শিশু বয়সে মেষ চরাতেন। বড় হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। হিজরতের পর মদিনার জীবনে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে তিনি পরিখা খননে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরিশ্রমী ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন। শ্রমিকের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللهِ -

অর্থ : 'শ্রমজীবী আল্লাহর বন্ধু।' (বায়হাকি)

মহানবি (স.) আরও বলেন, 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নাই। আল্লাহর নবি দাউদ (আ.) নিজের হাতে কাজ করে খেতেন।' (বুখারি)

প্রিয় নবি (স.)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে জাঁতা ঘোরাতেন। আর এ জন্য তাঁর হাতে জাঁতা ঘুরানোর দাগ পড়ে গিয়েছিল। এমনিভাবে তিনি নিজেই পানির মশক বয়ে আনতেন। এতে তাঁর বুকে দড়ির দাগ পড়েছিল। ঘরের সকল কাজ তিনি নিজে করতেন। নিজে ঝাড়ু দিতেন। সাহাবিগণ এক দিন নবি করিম (স.)-কে জিজ্ঞেস করেন, কোন প্রকার উপার্জন উত্তম? নবি করিম (স.) জবাবে বলেন, 'মানুষের নিজ হাতের কাজের বিনিময় এবং সৎ ব্যবসায় থেকে প্রাপ্ত মুনাফা।' (সুনানে আহমাদ)

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজে এবং তাঁর সাহাবিগণ জীবিকার জন্য পরিশ্রম করতে লজ্জাবোধ করতেন না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা শ্রমজীবীদের প্রশংসায় বলেন, 'এমন বহুলোক আছে যারা জমিনের দিকেদিকে ভ্রমণ করে ও আল্লাহর অনুগ্রহ খুঁজে বেড়ায়।' (সুরা মুযযাম্মিল, আয়াত ২০)

ইসলামে শ্রমিকের মজুরি সাথে সাথে আদায় করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'মজুরের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি আদায় করে দেবে।' (বায়হাকি)

সুতরাং আমরা সবাই শ্রমের প্রতি মর্যাদাশীল হব, নিজেদের কাজ নিজেরাই করব এবং আমরা নিজেরা স্বাবলম্বী হব।

কাজ: কী কী কাজ শিক্ষার্থী নিজেরা করতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৭

ক্ষমা (اَلْعَفْوُ)

মহান আল্লাহর অন্যতম গুণ ক্ষমা। সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য মানুষের এ গুণটি থাকা খুবই প্রয়োজন।

ক্ষমার আরবি প্রতি শব্দ 'আফ্উন' (عَفْوٌ)-এর অর্থ মাফ করা, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। ইসলামি পরিভাষায় এর অর্থ হলো প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নিয়ে মাফ করে দেওয়া।

গুরুত্ব

মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি মানুষকে অনেক নিয়ামত দান করেছেন। মানুষের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানুষ তার অজ্ঞতার কারণে সেই সর্বশক্তিমান প্রভুর কথা ভুলে যায়, তাঁর হুকুম অমান্য করে, তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করে। পরে যখন মানুষ নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়,তখন আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহর ঘোষণা 'তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন।' (সুরা শুরা,আয়াত ২৫)

আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ তাঁর রাসুল (স.)-কে ক্ষমার নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ○

অর্থ : 'আপনি ক্ষমা করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন।' (সুরা আ'রাফ, আয়াত ১৯৯)

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

অর্থ : 'অতএব আপনি তাঁদের ক্ষমা করে দিন এবং তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' (সুরা আলে-ইমরান, আয়াত ১৫৯)

যেসব মানুষ আল্লাহ এবং তাঁর দেওয়া বিধান অমান্য করে, পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ সেসব বান্দাকে ক্ষমা করে দেন।

ক্ষমার ব্যাপারে মহান রাব্বুল আলামিনের নীতি ও আদর্শ আমাদের অনুসরণ করা আবশ্যক। মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, কোনো কাজে বা কথায় তার ভুল-ত্রুটি হয়ে যেতে পারে। অতএব অন্যের ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে আমাদের দেখা উচিত।

মানুষকে ক্ষমা করলে আল্লাহ খুশি হন এবং যে ক্ষমা করে আল্লাহ তার গুনাসমূহ ক্ষমা করে দেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

অর্থ : 'আর যদি তুমি তাঁদের মার্জনা কর, তাঁদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' (সুরা তাগাবুন, আয়াত ১৪)

মহানবি (স.) ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক। একবার এক ইয়াহুদি মহিলা প্রিয় নবি (স.)-কে তার বাড়িতে দাওয়াত দেন এবং বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত তাঁকে খেতে দেন। রাসুল (স.) উক্ত গোশতের কিছু খেতেই বিষক্রিয়া অনুভব করেন। পরে ঐ মহিলা গোশতে বিষ দেওয়ার কথা স্বীকার করে। কিন্তু প্রিয় নবি (স.) তাকে ক্ষমা করে দেন। এমনিভাবে মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স.) প্রাণের শত্রুদেরকেও ক্ষমা করে দেন। তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা মুক্ত স্বাধীন।' পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ক্ষমার উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি নেই।

অপরাধীকে ক্ষমা করলে অপরাধী লজ্জিত হয়ে অপরাধ ছেড়ে দেয়। শত্রুকে ক্ষমা করলে শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়। আমরা অন্যকে ক্ষমা করব। অন্যকে ভালোবাসব।

কাজ: শিক্ষার্থীরা ক্ষমার ছোট ছোট ঘটনা যা নিজের জীবনে ঘটেছে, তা নিজের ভাষায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৮

অসদাচরণ (اَخْلَاقٌ ذَمِيْمَةٌ)

এমন কিছু আচরণ বা কাজ যা মানুষকে হীন, নিচু ও নিন্দনীয় করে তোলে, সেগুলোকে আখলাকে যামিমা বা নিন্দনীয় আচরণ বলে। নিন্দনীয় আচরণগুলো হচ্ছে হিংসা, ক্রোধ, লোভ, প্রতারণা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, ইভ টিজিং, ছিনতাই প্রভৃতি। এ নিন্দনীয় আচরণগুলো মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে কলুষিত করে। এ চরিত্রের অধিকারীকে মানুষ ঘৃণা করে। ইহকাল ও পরকালে সে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হবে। জাহান্নামের নিম্নস্তরে পৌঁছে যায়।' (তাবারানি)

আখলাকে যামিমার কুফল

১. ঘৃণার পাত্র

হীন বা মন্দ চরিত্রের লোকেরা সমাজের কাছে যেমনিভাবে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়, তেমনিভাবে পরিবারের কাছেও ঘৃণিত হয়। পরকালেও সে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, 'বান্দা তার কুচরিত্রের কারণে জাহান্নামের নিম্নস্তরে পৌঁছে যায়।' (তাবারানি)

২. জান্নাত থেকে বঞ্চিত

মন্দ চরিত্রের লোকেরা পরকালে জান্নাত লাভ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَلْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ -

অর্থ : 'দুশ্চরিত্র ও রূঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' (আবু দাউদ)

চরিত্র সংশোধন ব্যতীত আত্মার সংশোধন সম্ভব হয় না। এ জন্য চারিত্রিক দুর্বলতার সব দিকগুলোর সংশোধন করা আবশ্যক।

কাজ: শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অসদাচরণের কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৯

হিংসা (اَلْحَسَدُ)

অন্যের সুখ-সম্পদ, মানসম্মান নষ্ট হওয়ার কামনা এবং নিজে এর মালিক হওয়ার বাসনা করাকে হিংসা বলে। হিংসা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ 'হাসাদুন' (حَسَدٌ), যার অর্থ হিংসা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি।

অপকারিতা

হিংসা একটি মারাত্মক মানসিক ব্যাধি। হিংসা বহু কারণে সৃষ্টি হয়। যেমন: শত্রুতা, লোভ, অহংকার, নিজের অসৎ উদ্দেশ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা, নেতৃত্বের লোভ ইত্যাদি। এসব কারণে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ করে থাকে। ইসলাম এ কাজগুলোকে হারাম ঘোষণা করেছে। হিংসার অপকারিতা সীমাহীন। হযরত আদম (আ.)-এর মর্যাদা দেখে ইবলিস তার প্রতি হিংসা করে। ফলে সে অভিশপ্ত হয়। আল্লাহ তা আলার দয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

মানব সৃষ্টির পর হিংসার কারণেই সর্বপ্রথম পাপ সংঘটিত হয়। আদম (আ.)-এর পুত্র কাবিল হিংসার বশবর্তী হয়ে তারই আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে। হিংসা মানুষের ভালো কাজগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেছেন,

إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ-

অর্থ : 'আগুন যেমন শুকনা কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়, হিংসা তেমনই পুণ্যকে ধ্বংস করে দেয়'। (ইবনে মাজাহ্)

হিংসা মানুষের শান্তি বিনষ্ট করে। মনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখে। হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহ এবং মানুষের কাছে ঘৃণিত। কেউ তাকে ভালোবাসে না। কেউ তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। সমাজের লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলে। হিংসা সমাজে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মারামারি এবং অশান্তি সৃষ্টি করে। মানুষের মনে অহংকার সৃষ্টি হয়। অহংকার মানুষের পতন ঘটায়।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে হিংসা থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

অর্থ : 'আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই যখন সে হিংসা করে।' (সুরা ফালাক, আয়াত ৫)

আল্লাহ তা আলা হিংসা বর্জনকারীকে ভালোবাসেন। হিংসা বর্জনকারী জান্নাত লাভ করবেন। প্রিয় নবি একবার তাঁর এক সাহাবিকে জান্নাতি বলে ঘোষণা দেন। তিনি কী আমল করেন এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা আলা যাকে কোনো উত্তম বস্তু দান করেছেন আমি তার প্রতি কখনই হিংসা পোষণ করি না। (ইবনে মাজাহ)

আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিৎ 'আমরা হিংসা করব না। নিজের ক্ষতি করব না। সমাজের শান্তি বিনষ্ট করব না।'

কাজ: শিক্ষার্থীরা হিংসার কুফলের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১০

ক্রোধ (اَلْغَضَبُ)

'ক্রোধ' এর আরবি প্রতি শব্দ 'গাদাব'(غَضَبٌ), যার অর্থ রাগ। স্বীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়া বা কারো দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ার কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় মানুষের মনের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়,তাকে ক্রোধ বলে। অহংকার, তিরস্কার, ঝগড়া প্রভৃতি কারণে ক্রোধের সৃষ্টি হয়।

ক্রোধ ও রাগের ফলে মানুষ অনেক নির্দয় ও অত্যাচারমূলক কর্মকাণ্ড করে ফেলে। পরবর্তিতে এর কারণে লজ্জিত ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হয়। তাই মুসলমানদের উচিত ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করা। এ বিষয় মহানবি (স.) বলেন,

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ -

অর্থ : 'শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয়, যে খুব কুস্তি লড়তে পারে। বরং প্রকৃত শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে।' (বুখারি ও মুসলিম)

অপকারিতা

ক্রোধ একটি নিন্দনীয় বিষয়।এটি মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আর হিংসা মানুষের সৎকর্মসমূহ শেষ করে দেয়। ক্রোধের সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। ক্রোধ মানুষের ইমানকে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'সিরকা মধুকে যেভাবে বিনাশ করে, ক্রোধও ইমানকে তদ্রূপ নষ্ট করে।' (বায়হাকি)

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রিয় নবির সাহাবি হযরত ইবনে উমার (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে জানতে চাইলেন, এমন কোনো কাজ আছে যা আল্লাহ তাআলার গযব থেকে রক্ষা করবে? রাসুল (স.) বলেন, 'তুমি রাগ করবে না' । (তাবারানি)

ক্রোধ সংবরণ করা একটি পুণ্যের কাজ। রাসুল (স.)-এর এক সাহাবি একবার রাসুল (স.)-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল,আপনি আমাকে একটি ভালো কাজের নির্দেশ দিন।' প্রিয় নবি (স.) তাকে বললেন 'তুমি রাগ করবে না।' (বুখারি)

মহানবি (স.) বলেছেন, ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে, শয়তান আগুনের তৈরি। আর আগুনকে পানি ঠাণ্ডা করে। যদি কারও রাগ হয়,তবে তার উচিত উযু করে নেওয়া। (বুখারি ও মুসলিম)

কাজ: শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে হিংসা পরিহারের উপায়গুলো বের করবে এবং পোস্টারে লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১১

লোভ (اَلْحِرْصُ)

লোভ এর আরবি প্রতিশব্দ 'হারছুন'(حِرْصٌ), এর অর্থ লালসা, লিপ্সা, মোহ, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ইত্যাদি। অধিক পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে লোভ বলে। যেমন অর্থ-সম্পদের লোভ, পদমর্যাদার লোভ, খাদ্যদ্রব্যের লোভ, পোশাক-পরিচ্ছদের লোভ ইত্যাদি।

লোভের কুফল

লোভ মানুষের মনের শান্তি বিনষ্ট করে। অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে সারাক্ষণ বিভোর রাখে। ফলে নিজের কাছে যা আছে তাতে তুষ্ট না থেকে আরও পাওয়ার আশায় সে অস্থির থাকে।

লোভ মানুষকে নানা প্রকার অপরাধমূলক কাজের দিকে ধাবিত করে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, কালোবাজারি, মজুদদারি, দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া, সুদ-ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ লোভের কারণেই সংঘটিত হয়।

লোভী ব্যক্তি অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং অবৈধ উপায়ে তা হস্তগত করার চেষ্টা করে। ইসলাম এরূপ লোভকে নিষিদ্ধ করেছে। প্রিয় নবি (স.) বলেছেন- 'তোমরা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা এই জিনিসই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে এবং পরস্পরকে রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে উস্কিয়ে দিয়েছে। আর এই লোভ লালসার কারণেই তারা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করেছে।' (সহি মুসলিম)

খাদ্যের প্রতি লোভে অনেকে মাত্রাতিরিক্ত খায়। এতে সে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আবার কখনো তা তার জীবন নাশেরও কারণ হয়। আর তাই কথায় বলে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'

লোভ থেকে বাঁচার উপায়

ধৈর্য এবং অল্পে তুষ্টির গুণ থাকলে লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকা যায়। রাসুল (স.) বলেছেন, 'ইমান এবং লোভ এক অন্তরে একত্রিত হতে পারে না, কেননা ইমানের পরিনাম হচ্ছে ধৈর্য, তাওয়াককুল এবং অল্পে তুষ্ট থাকা।' (নাসাই ও তিরমিযি)

তাকদিরের ওপর বিশ্বাস রাখা লোভ দমনের প্রধান উপায়। মহানবি (স.) বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা চাওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা অবলম্বন কর। কেননা বান্দার ভাগ্যে যা নির্ধারিত আছে তার অতিরিক্ত সে পাবে না'। (হাকিম)

জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সহজ-সরল পথ অবলম্বন করলে লোভ বর্জন করা সম্ভব হয়। আমরা লোভের কুফল জানব। লোভ বর্জন করব। তাকদিরে বিশ্বাস করব। অল্পে তুষ্ট থাকব। নিজেরা সুখে থাকব। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব।

কাজ: শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে লোভের কুফল আলোচনা করে লোভ বর্জনের উপায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১২

প্রতারণা (اَلْغَشُّ)

প্রতারণার আরবি প্রতিশব্দ 'আল-গাস্‌শু' (اَلْغَشُّ) যার অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা। কথাবার্তা, আচার-আচরণ, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধোঁকা দেওয়াকে প্রতারণা বলে। পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে বিক্রি করা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইত্যাদি প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

কুফল

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতারণা একটি মানবতাবিরোধী অতি গর্হিত কাজ। এটি মিথ্যার শামিল। ইসলাম সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণকে সমর্থন করে না। কুরআন মজিদে ঘোষণা করা হয়েছে,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

অর্থ : 'তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ করো না এবং তোমরা জেনে-বুঝে সত্যকে গোপন করো না।' (সুরা বাকারা-আয়াত ৪২)

প্রতারণা একটি সামাজিক অপরাধ। কারণ এর ফলে মানুষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। প্রতারণাকারী খাঁটি মুসলমান নয়। আমাদের নবি (স.) একদিন বাজারে গিয়ে খাদ্যদ্রব্যের একটি বড় স্তূপ দেখতে পান। স্তূপটির উপরিভাগের দ্রব্য শুকনো ছিল। কিন্তু স্তূপটির ভেতরের অংশও শুকনো আছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তখন তিনি ভিতরের অংশ ভিজা দেখতে পেলেন। রাসুলুল্লাহ (স.) মালিকের কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। মালিক জানাল তাতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। তখন রাসুল (স.) তাকে বললেন, তুমি ভেজা খাদ্য উপরে রাখলে না কেন? যাতে লোকেরা তা দেখতে পেত?

এ প্রসংগে মহানবি বললেন,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ

অর্থ : 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়' (মুসলিম)

প্রতারণা মুনাফিকের কাজ। এর শাস্তি বড় কঠিন। সত্যিকার ইমানদার ব্যক্তি কখনই প্রতারণার আশ্রয় নেয় না। মানুষকে ধোঁকা দেয় না। অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।

আমরা প্রতারণা করব না। মানুষকে ধোঁকা দেব না। অঙ্গীকার ভঙ্গ করব না।

কাজ: শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে প্রতারণার কুফল আলোচনা করবে এবং এগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১৩

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া (عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ)

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বলতে বুঝায়, তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান না করা। পিতা-মাতার কথামত না চলা, তাঁদের নির্দেশ অমান্য করা। আল্লাহর অনুগ্রহের পর সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তাঁরা সন্তানের আপনজন। তাঁদের স্নেহ-মমতায় সন্তান লালিত-পালিত হয়। সন্তানের আরাম আয়েশের জন্য তাঁরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাঁরা সবরকম ব্যবস্থা করেন। কাজেই সন্তানের কর্তব্য হলো পিতা-মাতার বাধ্য থাকা।

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া জঘন্য অপরাধ। এর অপকারিতা অনেক।

অপকারিতা

১. শির্‌কের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।

২. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পাপ এত ভয়াবহ যে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এ পাপ ক্ষমা করেন না। এ বিষয় রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'মহান আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সকল পাপই ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার পাপ তিনি ক্ষমা করেন না।' (বায়হাকি)

৩. পিতা-মাতার অবাধ্য হলে পরকালে জাহান্নামের কঠিন আগুনে জ্বলতে হবে।

এ বিষয় রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তারাই (পিতা-মাতা) তোমার বেহেশত ও দোযখ।' (ইবন মাজাহ)।

অর্থাৎ পিতা-মাতার সন্তুষ্টির ওপর যেমন সন্তানের জান্নাত লাভ নির্ভর করে, ঠিক তেমনি তাঁদের অসন্তুষ্টির কারণে সন্তান দোযখবাসী হবে। নবি করিম (স.) আরও বলেন, 'তার সর্বনাশ হোক, তার সর্বনাশ হোক।' তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! সে কে? তখন তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতার যেকোনো একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, তবুও সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারল না।' (মুসলিম)

৪. মাতার অবাধ্য হওয়াকে আল্লাহ তাআলা হারাম ঘোষণা করেছেন।
রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য মায়েদের অবাধ্য হওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।' (সহিহ্ বুখারি)

৫. পিতা-সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।
রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।' (তিরমিযি)

পিতা-মাতা সন্তানের কল্যাণেই কখনো তাঁদের শাসন করেন বা কড়া কথা বলেন। এটা সন্তানকে মেনে নিতে হবে। এতে তার ভবিষ্যৎ সুখময় হবে।

আমরা পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধ মেনে চলব। এটি মানবিক দায়িত্ব। এতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন। আল্লাহর আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

কাজ: শিক্ষার্থীরা ৪/৫টি দলে ভাগে হয়ে পিতা-মাতার অবাধ্যতার পরিণতি কী তার একটি তালিকা তৈরি করবে

পাঠ ১৪

ইভটিজিং (Eve Teasing)

ইভ টিজিং শব্দটি ইভ (Eve) ও টিজিংয়ের (Teasing)- একত্রিতরূপ। বাইবেল অনুসারে প্রথম নারীর নাম ইভ (Eve)। এখানে 'ইভ' বলতে নারী সমাজকে বুঝানো হয়েছে। আর 'Tease' অর্থ পরিহাস, প্রশ্ন প্রভৃতি দ্বারা জ্বালাতন করা, উত্ত্যক্ত করা, খেপানো। ইভ টিজিং বলতে কথা, কাজ, আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে নারীদের উত্ত্যক্ত করাকে বুঝানো হয়েছে। নারীদের প্রতি অশালীন উক্তি করা, অশ্লীল অঙ্গাভঙ্গি করা ইভ টিজিংয়ের অন্তর্ভুক্ত।

অপকারিতা

ইভ টিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি। নারীদেরকে উত্ত্যক্ত করা, কাউকে মন্দনামে ডাকা বা উপহাস করা গর্হিত কাজ। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

অর্থ : 'তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করবে না এবং একে অপরকে মন্দনামে ডাকবে না। ইমান গ্রহণের পর মন্দনামে ডাকা বড় ধরনের অপরাধ।' (সুরা হুজরাত, আয়াত ১১)

বর্তমানে প্রায়ই স্কুল-কলেজের সামনে, রাস্তার মোড়ে, গলির মুখে কিছু বখাটে ছেলে দাঁড়িয়ে মেয়েদেরকে উত্ত্যক্ত করে। এর ফলে অনেক মেয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে। কেউ কেউ আবার আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। এতে সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়। সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। জাতি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।

প্রতিকার

পারিবারিক অনুশাসন, ধর্মীয় শৃঙ্খলা, সামাজিক সচেতনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আমরা ইভ টিজিংয়ের মত খারাপ কাজ করব না। আমরা সব সময় ভদ্র, নম্র, শালীন আচরণ করব। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করব।

কাজ: শিক্ষার্থীরা ইভ টিজিংয়ের ফলে কী কী সামাজিক ক্ষতি হয় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১৫

ছিনতাই (اَلْاِنْتِهَابُ)

জোরপূর্বক বা বল প্রয়োগ করে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়াকে ছিনতাই বলে। ছিনতাই একটি সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড। এতে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়। মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। নিরপত্তাহীনতায় থাকে।

কুফল

ছিনতাই একটি জঘন্য সামাজিক অনাচার। এটি চুরি-ডাকাতি অপেক্ষা মারাত্মক। ছিনতাই সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে। সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। এর ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। মানুষের মূল্যবান অর্থ সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

ছিনতাইকারী দুনিয়াতে ও আখিরাতে নির্মম শাস্তি ভোগ করবে। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهٗ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

অর্থ : 'যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ জমি ছিনতাই করে, কিয়ামতের দিন সাতগুণ জমি তার গলায় বেড়িরূপে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।' (সহি বুখারি ও মুসলিম)

যে ছিনতাই করে তার পূর্ণ ইমান থাকে না। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যে ছিনতাই ও লুটতরাজ করলে সে মুমিন থাকে না'

ছিনতাই বর্বর যুগের চরিত্রবিশেষ। ইসলাম এ বর্বরতাকে সম্পূর্ণ উৎপাটন করার লক্ষ্যে ঘোষণা করেছে,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْاِسْلَامِ

অর্থ : 'ইসলামি বিধানে না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নিয়ম আছে, না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নিয়ম আছে' ।

পবিত্র কুরআন মাজিদে এবং মহানবি (স.)-এর হাদিসে ছিনতাই, ডাকাতি, লুটতরাজ ইত্যাদি অপকর্মের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রতিকার

এ ধরনের সামাজিক অপরাধ, অনাচার, অত্যাচার থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। সে জন্য সামাজিক সচেতনতা প্রয়োজন।

মানুষকে ছিনতাই এর কুফল সম্পর্কে সচেতন করা এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে এর অপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন।

অপরাধীদেরকে এরূপ সামাজিক অনাচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে আইনের হাতে সোপর্দ করতে হবে।

সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে এ ধরনের অনাচার সমাজ থেকে দূর হবে।

আমরা ছিনতাইয়ের কুফল অনুধাবন করব। এ ধরনের জঘন্য কাজে লিপ্ত হব না। এ জঘন্য কাজ যারা করে তাঁদেরকে এ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করব।

কাজ: শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে ছিনতাইয়ের কুফল আলোচনা করে এর প্রতিকারের উপায়গুলো শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. প্রশংসনীয় ..... মাধ্যমেই উত্তম চরিত্র গড়ে ওঠে।

২. পরোপকারের মাধ্যমে সমাজে ..... প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. শালীনতা মানুষের ..... অপরিহার্য বিষয়।

৪. মানুষের ওপর প্রধানত ..... ধরনের কর্তব্য রয়েছে।

৫. সমাজের প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ দায়িত্ব তার নিকট পবিত্র .....।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আখলাকে যামিমা হচ্ছে	গচ্ছিত রাখা
২. আমানত অর্থ	সামাজিক অপরাধ
৩. সকল সৃষ্টিই আল্লাহ তাআলার	নিকৃষ্ট চরিত্র
৪. প্রতারণা একটি	পরিজন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ক্রোধের ক্ষতিকর অবস্থা ব্যাখ্যা কর।

২. পরোপকারের পাঁচটি সুফল লেখো।

৩. আমানত রক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আমার নিকট প্রিয়,যার চরিত্র সর্বোত্তম' – হাদিসটির ব্যাখ্যা লেখো।

২. 'লোভের কারণেই যত বিপর্যয়' – উক্তিটির ব্যাখ্যা করে লোভ থেকে মুক্তির পাঁচটি উপায় বর্ণনা কর।

৩. 'অশালীন পোশাক ও আচরণ' বিপর্যয় ডেকে আনে, উদাহরণসহ লেখো।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোন যুদ্ধে বিজয়ের পর ইয়াহুদি মহিলা মহানবি (স.)-কে বিষ মিশ্রিত গোশত খেতে দেয়?

ক. বদর খ. উহুদ

গ. খাইবার ঘ. হুনাইন।

২. [illegible]

ক. [illegible] খ. [illegible]

গ. [illegible] ঘ. [illegible]

৩. [illegible] -

i. আল্লাহর অনুগত বান্দা হতে সাহায্য করে

ii. পরিবেশের প্রতি সদাচরণে সহায়তা করে

iii. অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে

কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাবির আবিরের নিকট একটি বই জমা রাখল। দুই দিন পর বইটি ফেরত চাইলে আবির উহা ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়।

৪. আবিরের দ্বারা কী লঙ্ঘিত হয়েছে?

ক. আহদ খ. আমানত

গ. আদল ঘ. তাহসিব।

৫. আবিরকে বলা যায় -

ক. মুশরিক খ. মুনাফিক

গ. ফাসিক ঘ. কাফির।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রহিম সাহেব [illegible] দীর্ঘ দিন পরে রজব মিয়া রহিম সাহেবের বাড়িতে বিপদে আসলে, রহিম সাহেব তাঁর জমির দলিল হাতে দিয়ে জমি বুঝিয়ে দেন। অপর দিকে আরমান সাহেবের ড্রাইভার রমিজ মিয়া বিদেশে যাওয়ার জন্য জমি বিক্রি করে আরমান সাহেবের নিকট দুই লাখ টাকা দেন। আরমান সাহেব তাকে বিদেশে পাঠানোর কথা বলে একটি জাল ভিসা তৈরি করে দেন। রমিজ মিয়া এর মাধ্যমে বিদেশে যেতে ব্যর্থ হয়ে টাকা ফেরত চাইলে আরমান সাহেব বলেন, তোমাকে ভিসা দেওয়া হয়েছে, কাজেই তুমি বিদেশে যেতে না পারার দায়ভার আমি বহন করব না।

ক. কিসে মনের শান্তি নষ্ট করে?

খ. আখলাকে হামিদা বলতে কী বোঝায়?

গ. রহিম সাহেবের কাজটির মাধ্যমে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ড্রাইভার রমিজ মিয়ার সাথে আরমান সাহেবের আচরণ বিশ্লেষণ কর।

২। শিল্পপতি জামিল সাহেব তাঁর গার্মেন্টসে কর্মচারীদের যথাসময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পরিশোধ করেন। তিনি সততার সাথে কাজ করতে এই বলে সতর্ক করে দেন, যেন তার কারখানায় তৈরি পোশাকে কোনোরকম সমস্যা না থাকে; কাপড় কম দেওয়া বা সেলাইয়ে সুতা যেন কম না হয়। তারপরেও এক কর্মচারী ইচ্ছাকৃতভাবে কাপড় কম দিয়ে পোশাক তৈরি করে। ঐ কর্মচারী কাপড় কম দেওয়ার বিষয়টি গোপন রাখে; এতে জামিল সাহেবের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে জামিল সাহেব ঐ কর্মচারীর চাকরি বন্ধ করে দেন। একপর্যায়ে সামান্য বেতনের ঐ কর্মচারীর পরিবারের সমস্যার কথা বুঝিয়ে জামিল সাহেব কর্মচারীকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন।

ক. ক্ষমা এর আরবি প্রতিশব্দ কী?

খ. শ্রমের মর্যাদা বলতে কী বোঝায়?

গ. জামিল সাহেবের সর্বশেষ আচরণে যে গুণটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কর্মকাণ্ড একটি সামাজিক অপরাধ-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করলেই মানুষ সেরা হতে পারে। যে জীবন অনুসরণ ও অনুকরণ করলে মানুষের জীবন সুন্দর ও সফল হয়, তাকে আদর্শ জীবন বলে। আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে যে সব নবিও রাসুল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের জীবনই আমাদের জন্য আদর্শ। এমনিভাবে যেসব মনীষী, নবি ও রাসুলগণের পথ অনুসরণ করেছেন তাঁরাও আদর্শ মানুষ। তাঁদের জীবনের ভালো দিকগুলো আমাদের আদর্শ।

এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী–

- আদর্শ জীবনচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত মুহাম্মদ (স.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা), হযরত মারিয়াম (আ.) ও হযরত ফাতিমা (রা.)–এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে পারবে।
- মনীষীগণের গুণাবলি যেমন– সমাজসেবা, সাম্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সৌহার্দ, মানবিকতা, আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ, ক্ষমা, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায়বিচার, দানশীলতা, পরোপকারিতা, দেশপ্রেম, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে তাঁদের অবদান ও শিক্ষা ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করতে পারবে।
- বাস্তব জীবনে মনীষীগণের গুণাবলি অনুসরণ করে আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে।
- দলগত কাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে এবং সামগ্রিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানে আগ্রহী হতে পারবে।

পাঠ ১

হযরত ইসমাঈল (আ)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবি। তিনি হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তার মাতার নাম হাজিরা (আ.)। তিনি খ্রিষ্ট পূর্ব ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর। তিনি কুরাইশ ও উত্তর আরবের 'আদনান' বংশের আদি পিতা।

নির্বাসন ও জমজম কূপ সৃষ্টি

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জন্মের কিছুদিন পর তাঁর পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে ও তাঁর মাতাকে নির্জন ভূমিতে রেখে আসেন। তিনি তাঁদেরকে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে আসেন এবং তাঁদের জন্য এ বলে দোয়া করেন- "হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট। 'হে আমার প্রতিপালক! এ জন্য যে তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাঁদের রিজিকের ব্যবস্থা কর, যাতে তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।' (সুরা ইবরাহিম, আয়াত ৩৭)

অল্প কিছুদিন পর তাঁদের খাবার ফুরিয়ে যায়। শিশু ইসমাঈল পানির পিপাসায় কাতর হয়ে ওঠেন। তার চিৎকারে মা হাজিরা (আ.) অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাতবার ছোটাছুটি করেন। কিন্তু কোথাও পানি পেলেন না। অবশেষে ফিরে এসে দেখতে পান শিশু ইসমাঈলের পদাঘাতে আল্লাহর হুকুমে সে স্থানে পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে আর এটাই হলো জমজম কূপের উৎস। হযরত হাজিরা (আ.) ঐ কূপ থেকে নিজে পানি পান করেন এবং তাঁর শিশু পুত্রকেও তা পান করান। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। এ কূপকে কেন্দ্র করে জুরহাম গোত্র সেখানে বসবাস শুরু করে। এ গোত্রে হযরত ইসমাঈল (আ.) বিবাহ করেন। কুরাইশ গোত্র এ গোত্রের একটি শাখা।

কুরবানি

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার নির্দেশ ছিল একটি পরীক্ষা। একদা হযরত ইবরাহিম (আ.) সিরিয়া থেকে বিবি হাজিরা ও পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে দেখতে মক্কায় গমন করেন। তখন হযরত ইবরাহিম (আ.) স্বপ্নযোগে পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করতে আদিষ্ট হন। তখন ইসমাঈলের বয়স ছিল ১৩ বছর। জাগ্রত হয়ে হযরত ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে বলেন: 'হে পুত্র! স্বপ্নে দেখলাম আমি তোমাকে কুরবানি করছি। তুমি কী বল?' তখন পুত্র ইসমাঈল কোনোরূপ বিচলিত না হয়ে আনন্দ চিত্তে উত্তরে বলেন, 'হে পিতা! আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ আমাকে আপনি ধৈর্যশীল দেখতে পাবেন।' (সুরা আস-সাফফাত, আয়াত ১০২)

হযরত ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার উদ্দেশ্যে 'মিনা'র পথে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে শয়তান ইসমাঈল (আ)-কে বারবার প্রতারিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়ে নির্বিঘ্নে মিনায় পৌঁছেন। হযরত ইবরাহিম (আ.) প্রাণ-প্রিয় পুত্রকে কুরবানি করার জন্য উদ্যত হলেন। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহিম (আ.) আওয়াজ শুনতে পেলেন, 'হে ইবরাহিম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি'। (সুরা আস-সাফফাত, আয়াত ১০৫) অলৌকিকভাবে পুত্র ইসমাঈল (আ.)-এর স্থলে একটি দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল আর ইসমাঈল (আ.) দুম্বার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এ ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের এ পশু কুরবানি। কুরবানি করা ওয়াজিব।

কাবাগৃহ নির্মাণ

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর হুকুমে তাঁরই প্রদর্শিত স্থানে প্রথম কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন- 'স্মরণ কর! যখন ইবরাহিম ও ইসমাঈল কাবাঘরের প্রাচীর তুলে ছিল, তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত'। (সুরা বাকারা, আয়াত ১২৭)। হযরত ইবরাহিম (আ.) পাথরের গাঁথুনি লাগাতেন আর ইসমাঈল (আ.) তাকে পাথর তুলে দিতেন। দীর্ঘ সময় ধরে পিতা-পুত্র কাবাঘর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করেন।

উপাধি লাভ

হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন ধৈর্যশীল ও পিতাভক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে 'ছাদেকুল ওয়াদ' (অঙ্গীকার পালনকারী) উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্ণিত আছে যে তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে অঙ্গীকার করেছেন: অমুক স্থানে তার জন্য অপেক্ষা

করবেন, লোকটি কথা অনুযায়ী সে স্থানে না আসলেও তিনি তার জন্য তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকেন এবং তৃতীয় দিন তার সাথে সেখানে দেখা হয়। (ইবন্ কাছির)

নিজের ওয়াদা রক্ষার জন্য তিন দিন পর্যন্ত কষ্ট করে অপেক্ষা করেছিলেন বলে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহ ছাদেকুল ওয়াদ বা অঙ্গীকার পালনকারী উপাধি দান করেছিলেন।

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশেই জন্মগ্রহণ করেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। হযরত ইসমাঈল (আ.) একশত ছত্রিশ বছর বয়সে মক্কা নগরীতে ইন্তিকাল করেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) কর্তৃক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, পিতৃভক্তি, ত্যাগ, অঙ্গীকার পালন ইত্যাদি আমাদের জীবনের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

কাজ: শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানির কাহিনী, জমজমের উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করবে।

পাঠ ২

হযরত ইউসুফ (আ.)

পরিচয়

হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবি। তাঁর পিতার নাম হযরত ইয়াকুব (আ.) আর মাতার নাম রাহিলা বিন্তে লাবন। তিনি হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর একাদশতম পুত্র। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ১৯২৭-১৮১৭ -এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কেনানের অধিবাসী। শারীরিক গঠনে অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী। আর ব্যবহারে বিনয়ী ও উত্তম চরিত্র গুণে গুণান্বিত। পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীকে 'আহসানুল কাসাস' (সর্বোত্তম কাহিনী) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ষড়যন্ত্রের কবলে হযরত ইউসুফ (আ)

হযরত ইয়াকুব (আ.) স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-কে অনেক আদর করতেন। এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর বিন ইয়ামিন ব্যতীত অন্যান্য বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। তারা তাঁর ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর অনুমতি নিয়ে একদিন তারা তাঁকে খেলার কথা বলে নির্জন একটি মাঠে নিয়ে যায়। সেখানে তারা তাঁকে মারধর করে একটি গভীর কূপে নিক্ষেপ করে। বাড়িতে ফিরে এসে তাঁরা পিতাকে বলে, আমরা যখন খেলাধুলা করছিলাম তখন একটি বাঘ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং খেয়ে ফেলে। দেখুন এই যে তাঁর রক্তমাখা জামা-কাপড়। কিন্তু হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁদের কথায় বিশ্বাস করলেন না, বরং মর্মাহত হলেন। তিনি ক্রোধ প্রকাশ না করে ধৈর্যধারণ করে বললেন, 'ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ আমার সাহায্যস্থল'। (সুরা ইউসুফ, আয়াত ১৮)

ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয়

একটি বণিকদল ঐ কূপের পাশ দিয়ে মিসরে যাচ্ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় দলটি কূপের ধারে এসে থামল। তাঁরা পানির জন্য কূপের ভিতরে বালতি ফেললে হযরত ইউসুফ (আ.) বালতির রশি ধরে উপরে উঠে আসেন। তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী সুখবর! এ যে এক কিশোর! অতঃপর তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল'।

(সুরা ইউসুফ, আয়াত ১৯)। তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মিসরে দাস হিসেবে বিক্রি করে। মিসরের শাসক আজিজ তাঁকে স্বল্প মূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের (মুদ্রা) বিনিময়ে ক্রয় করেন। তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পুত্রের মতো ভালোবাসতে থাকেন। হযরত ইউসুফ(আ.) যুবক বয়সে মিথ্যা অপবাদের দায়ে কারাবরণ করেন। তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিমত্তার দরুণ ক্রমান্বয়ে কারাগারে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেন। তিনি স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

একদিন মিসরের বাদশাহ স্বপ্ন দেখেন, 'সাতটি সুস্থ-সবল গাভিকে সাতটি দুর্বল গাভি খেয়ে ফেলছে। তিনি আরও দেখেন সাতটি সবুজ শস্য শিষ এবং সাতটি শুষ্ক শিষ।' তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য রাজদরবারে জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতদের ডাকেন। কিন্তু কারোর ব্যাখ্যা তাঁর পছন্দ হয়নি। বাদশাহ খবর পেলেন কারাগারে এক যুবক আছেন, যিনি স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করতে পারেন। অবশেষে বাদশাহ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চান। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় হযরত ইউসুফ (আ.) বলেন, 'দেশে সাত বছর প্রচুর শস্য উৎপন্ন হবে। আর পরবর্তী সাত বছর একটানা ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলবে।' সাথে সাথে তিনি দুর্ভিক্ষ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়ও বলে দিলেন।এ ব্যাখ্যা বাদশাহের অত্যন্ত মনঃপূত হলো। ফলে তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ তুলে নেন এবং তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন।

মন্ত্রী পদ লাভ

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় খুশি হয়ে বাদশাহ তাঁকে অর্থমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর প্রচুর খাদ্য-শস্য ফলন হয়। পরবর্তী সাত বছরে কম ফলন হওয়ায় মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অভাবের তাড়নায় তাঁর ভ্রাতারা তিনবার খাদ্য-শস্য সংগ্রহের জন্য রাজদরবারে আসে। প্রথমবারেই হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁদের চিনে ফেলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের নিকট নিজের পরিচয় প্রকাশ করেননি। তবে মানবিক কারণে প্রত্যেকবারই তাঁদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য-শস্য বরাদ্দ দেন। দ্বিতীয়বার কৌশলে আপন সহোদর বিন ইয়ামিনকে আটকিয়ে রাখেন। তৃতীয়বার নিজের পরিচয় প্রদান করেন এবং পিতার-পরিবারের লোকজনকে রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান। তখন ভ্রাতাগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বলে : 'তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরাতো অপরাধী ছিলাম।' (সুরা ইউসুফ, আয়াত ৯১)

হযরত ইউসুফ (আ.) এ বলে তাঁদের ক্ষমা করে দিলেন যে, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (সুরা ইউসুফ, আয়াত ৯২)

পরবর্তী সময়ে ভাইয়েরা তাঁদের বৃদ্ধ পিতাকে সাথে নিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট আগমন করেন। তিনি তাঁদেরকে উষ্ণসংবর্ধনা জানান। এরপর তাঁরা সকলে একসাথে মিলেমিশে বসবাস করতে থাকেন। হযরত ইউসুফ (আ.) ১১০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা হযরত ইউসুফ(আ.)-এর মতো বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করব। তার মতো চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করব এবং ক্ষমা করতে শিখব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা করবে।

পাঠ ৩

হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর জীবনাদর্শ

হযরত মুহাম্মদ (স.) নবুয়ত প্রাপ্তির পর মক্কা নগরীতে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। মক্কার পরিবেশ দাওয়াতের অনুকূল না থাকায় তিনি আল্লাহর নির্দেশে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন।

হিজরত ও দেশপ্রেম

হিজরত অর্থ ত্যাগ করা, ছিন্ন করা। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ বা ধর্মের নিরাপত্তার জন্য বাসভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করা। সত্য ও ন্যায়ের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো দেশে গমন করাই হিজরত। হিজরতের আর একটি অর্থ রয়েছে শরিয়তের নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করা। মক্কা নগরীতে ইসলামের কাজ যখন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকল, তখন হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে হত্যা করার জন্য মক্কার কাফিররা সিদ্ধান্ত নিল। সে অনুযায়ী তারা এক রাতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ঘর অবরোধ করল। আল্লাহ তায়ালা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে কাফিরদের এ সিদ্ধান্তের ও অবরোধের কথা জানিয়ে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর কাছে রাখা আমানতের সম্পদগুলো হযরত আলী (রা.)-কে বুঝিয়ে দিলেন এবং স্বীয় বিছানায় তাঁকে রেখে হযরত আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে করে প্রত্যুষে কাফিরদের চোখ এড়িয়ে মদিনার দিকে রওয়ানা হলেন। কাফিররা ঘরে প্রবেশ করে মহানবি (স.)-এর বিছানায় হযরত আলী (রা)-কে দেখে ভীষণ রাগান্বিত হলো। তবে তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আমানতদারী দেখে লজ্জিত হলো। যাকে শত্রু ভেবে হত্যার জন্য তাঁদের এ প্রচেষ্টা, তিনি এত মহান ও উদার হতে পারেন তা তারা চিন্তাও করেনি। মহানবি (স.) আবু বকর (রা.)-কে নিয়ে সাওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এদিকে কাফিররাও তাঁদের খুঁজতে গুহার মুখ পর্যন্ত এসে পড়ল। আবু বকর (রা.) এ অবস্থা দেখে খুব বিচলিত হলেন। তখন হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁকে বললেন, 'তুমি চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' (সুরা তাওবা, আয়াত ৪০)। পরিশেষে হযরত মুহাম্মদ (স.) ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর মদিনায় পৌঁছলেন। মদিনার সর্বস্তরের লোক তাঁকে সাদরে গ্রহণ করল।

মক্কায় কাফিররা যতই নির্যাতন করল, হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁদের সব নির্যাতন সহ্য করলেন। তিনি তাঁর সাথীদের বিভিন্ন দেশে হিজরত করালেও প্রিয় জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে নিজে কোথাও যাননি। অবশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ আসল। হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন এবং জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে মদিনায় চলে গেলেন। তিনি জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়ার সময় মক্কাকে লক্ষ্য করে বললেন 'আল্লাহর কসম! তুমি আল্লাহর সর্বোত্তম ভূখণ্ড এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা প্রিয়ভূমি। আমাকে এখান থেকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়া না হলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।' (তিরমিযি)

মদিনা সনদ

হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে মদিনার সনদ উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রীয় বিভেদ নিরসন করে পারস্পরিক শান্তি-সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে কতিপয় নীতিমালা তৈরি করেন। যা মদিনা সনদ নামে খ্যাত। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান।

মদিনা সনদের ধারাসমূহ

সনদে মোট ৪৭টি মতান্তরে ৫০টি ধারা ছিল। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হলো-

১. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহকে নিয়ে একটি সাধারণ জাতি গঠিত হবে।

২. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহের কারো ওপর যদি বাইরের শত্রু আক্রমণ করে তবে সকল সম্প্রদায় মিলে শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে।

৩. কেউ মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কুরাইশদের কোনোরূপ সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবে না কিংবা তাঁদের সাথে কোনোরূপ গোপন চুক্তিও করতে পারবে না।

৪. সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্ম পালনে বাধা সৃষ্টি করবে না।

৫. কেউ যদি কোনোরূপ অপরাধ করে, তবে তার জন্য তাকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে। এ জন্য তার সম্প্রদায়কে দোষারোপ করা যাবে না।

৬. অসহায়, দুর্বল, অত্যাচারিতকে সর্বতোভাবে সাহায্য–সহযোগিতা করতে হবে।

৭. হত্যা, রক্তারক্তি ইত্যাদি কাজকর্ম এখন থেকে নিষিদ্ধ করা হলো।

৮. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হবেন এবং তিনিই পদাধিকার বলে প্রধান বিচারপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

মদিনা সনদের গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সনদের ফলে মদিনার লোকজনের মাঝে সকল হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহের অবসান হলো। তারা ঐক্যবদ্ধ হলো। ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা হলো। মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে এক উদার সম্প্রীতি স্থাপিত হলো।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ক্ষমতাবৃদ্ধি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়সহ ইসলাম প্রসারের কাজ আরও বেগবান হলো। নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গড়ে উঠল রাজনৈতিক ঐক্য এবং গোড়াপত্তন হলো একটি শান্তিময় ইসলামি রাষ্ট্রের।

মদিনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সুশাসন

মদিনা সনদের ফলে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হলো। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হলো একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্র। ফলে মুসলমানগণ বিনা বাধায় সকল ইসলামি বিধিবিধান পালন করার সুযোগ পেল। হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। তার সুশাসনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো-

ক. আইনের কর্তৃত্ব এবং সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর প্রতিষ্ঠা করা।

খ. ধর্ম, বর্ণ গোত্রভেদে সকল নাগরিকের প্রতি সুবিচার করা।

গ. মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ. সরকারের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

ঙ. মজলিসে শূরা বা পরামর্শ পরিষদ গঠন।

চ. ভালো কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করা ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলো।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর দূরদর্শিতা

জন্মভূমিকে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার অদম্য ইচ্ছা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মনে জাগ্রত হলো। অবশেষে ৬ষ্ঠ হিজরি মোতাবেক ৬২৮ খ্রিস্টাব্দের যিলকদ মাসে তিনি মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তার সাথে ছিল ১৪০০ (চৌদ্দশত) নিরস্ত্র সাহাবি। তাঁদের কোনো সামরিক উদ্দেশ্য ছিল না। প্রত্যেকের সাথে ছিল মাত্র একটি করে কোষবন্ধ তরবারি। তৎকালীন আরবে প্রত্যেক লোকের সাথেই এসব থাকত। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর সাথীদের নিয়ে মক্কার ৯ মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছেন। মক্কার কাফিররা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ শুনে খুব ভীতসন্ত্রস্ত হলো। তারা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য সদল বলে অস্ত্রসহ অগ্রসর হলো। হযরত মুহাম্মদ (স.) মুসলমানদের পক্ষ হতে তাঁদের নিকট হযরত উসমানকে দূত হিসেবে পাঠালেন। কাফিরদেরকে বুঝানো হলো যে মুসলমানরা শুধু হজ করে আবার চলে যাবে। হযরত উসমান (রা.) আসতে দেরি হওয়ায় মুসলমানদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) সাহাবিদের নিয়ে একটি গাছের নিচে সমবেত হলেন এবং উসমান হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য শপথ নিলেন। এ শপথ 'বাইয়াতে রিদওয়ান' নামে পরিচিত। মুসলমানদের কঠিন সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে কাফিররা হযরত উসমানকে মুক্তি দিল। অনেক বাগবিতণ্ডার পর মুসলমান ও কাফিরদের মাঝে চুক্তি হলো। এ চুক্তি 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। এ চুক্তির লেখক ছিলেন হযরত আলী (রা.)। চুক্তিতে অনেকগুলো শর্ত ছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো-

১. ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানগণ হজ সমাপন না করেই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবে।

২. কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে আগামী দশ বছর যেকোনো প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে।

৩. আগামী বছর মুসলমানগণ হজ করতে পারবে। কিন্তু তিন দিনের অধিক সময় মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না। সেই তিন দিন কুরাইশগণ নগর পরিত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করবে।

৪. হজে আগমনকালে মুসলমানগণ আত্মরক্ষার জন্য কেবল কোষবন্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে না।

৫. হজের সময় মুসলমানদের জানমাল নিরাপদ থাকবে।

৬. মক্কার বণিকগণ মদিনার পথ দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদে সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসায়–বাণিজ্য করতে পারবে।

৭. সন্ধির শর্তাবলি উভয় পক্ষকে পুরোপুরিভাবে পালন করতে হবে।

সন্ধির চুক্তিগুলো বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের বিপক্ষে মনে হলো। তবে বাস্তবে সব শর্তই মুসলমানদের অনুকূলে ছিল। সন্ধির ফলে পরবর্তীতে বিনা বাধায় মক্কা বিজয়সহ মুসলমানদের অনেক অগ্রগতি হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফুটে উঠল।

বর্তমান মুসলিম জাতির উচিত মদিনা সনদ ও হুদায়বিয়ার সন্ধি হতে শিক্ষা গ্রহণ করা। এর ফলে মুসলিম বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে।

কাজ–১ : শিক্ষার্থীরা দলে বসে আলোচনা করে মদিনা সনদের আটটি ধারার একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টারে লিখবে।

কাজ–২ : শিক্ষার্থীরা হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টারে লিখবে।

পাঠ ৪

হযরত উসমান (রা.)

পরিচয়

হযরত উসমান (রা.) ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আফফান, মাতার নাম ছিল ওরওয়াহ। ইসলামের চার খলিফার মধ্যে তিনি তৃতীয় খলিফা ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি নম্র, ভদ্র, লজ্জাশীল ও বিনয়ী ছিলেন। তার চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে রাসুল (স.) প্রথম তাঁর কন্যা রুকাইয়াকে তার নিকট বিবাহ দেন। রুকাইয়া মারা গেলে অতঃপর উম্মে কুলসুমকে তার নিকট বিবাহ দেন। ফলে তাকে 'যুননুরাইন' (দুই নুরের অধিকারী) বলা হতো। তিনি ব্যবসা করতেন বিধায় তার অনেক সম্পদ ছিল। তাই তাকে 'গণি'(ধনী) বলা হত। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে তার চাচা হাকাম তাকে অনেক নির্যাতন করে। তাঁর নিকটাত্মীয়রাও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে তিনি তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াসহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

ইসলামের সেবা

হযরত উসমান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর সর্বদা ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সর্বদা রাসুল (স.)-এর সাথে থাকতেন। এ কাজে তিনি তার সম্পদ উদার হস্তে ব্যয় করেন। তিনি নিজ খরচে মসজিদে নববি সম্প্রসারণ করেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দুঃস্থদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেন। তাবুক যুদ্ধে তিনি দশ হাজার দিনার (মুদ্রা) ও এক হাজার উষ্ট্র মুসলিম সেনাবাহিনীকে দান করেন।

খিলাফত লাভ ও কুরআন সংকলন

হযরত উসমান (রা.) ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে খলিফা নির্বাচিত হলেন। অতঃপর তিনি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনের পাশাপাশি পবিত্র কুরআন সংকলনে হাত দেন। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলে বিভিন্ন এলাকার লোকজন পবিত্র কুরআন বিভিন্নভাবে তিলাওয়াত করতে লাগল। ফলে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিল। তিনি এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। রাষ্ট্রিয় নির্দেশ জারি করে তখনকার সময়ে বিদ্যমান পবিত্র কুরআনের সকল কপি সংগ্রহ করলেন। হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের মূল কপিটি সংগ্রহ করার মাধ্যমে কুরআন সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন। অতঃপর মুসলিম জাহানের গভর্নরদের নিকট একটি করে কপি পাান। অবশিষ্ট সংগৃহীত কপিগুলো আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। পবিত্র কুরআনকে মূল ভাষা অনুযায়ী সংরক্ষণ করার ফলে তাকে 'জামেউল কুরআন' (কুরআন সংকলক) বলা হয়।

হযরত উসমান (রা.) দীর্ঘ ১২ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৮৩ বছর বয়সে কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে শাহাদত বরণ করেন। তাঁর ব্যাপারে রাসুল (স.) বলেছেন- 'প্রত্যেক নবিরই একজন বন্ধু রয়েছে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবেন উসমান'।

> কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে হযরত উসমান সম্পর্কে লেখাটি পাঠ করে শ্রেণিতে দলগতভাবে আলোচনা করবে।

পাঠ ৫

হযরত আলী (রা.)

পরিচয়

হযরত আলী (রা.) ছিলেন রাসুল (স.)-এর চাচাতো ভাই। তিনি ৬০০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবু তালিব, মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ। তিনি ছোটদের মধ্যে প্রথম মুসলমান। তিনি ১০ বছর বয়সে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি 'আশারা-ই-মুবাশ্‌শারার' (জান্নাতের সুসংবাপ্রাপ্ত দশজন সাহাবি)-এর একজন এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা। ছোটকাল থেকেই জ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। তাই তিনি সর্বদা রাসুল (স.)-এর সাথে থাকতেন। রাসুল (স.)-এর প্রতি তার ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল অসীম। রাসুল (স.) তাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর অতি আদরের কন্যা ফাতিমাকে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে বিবাহ দেন। হযরত আলী (রা.) খুব নির্ভিক ও সাহসী ছিলেন। রাসুল (স.) হিজরতের সময় তাকে তাঁর বিছানায় রেখে যান। রাসুল (স.)-এর কাছে আমানত রাখা সম্পদ, মূল মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার দায়িত্বও তাকে দেওয়া হয়। এতে তাঁর জীবনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এরপরও তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

বীরত্ব ও জ্ঞানসাধনা

হযরত আলী (রা.) ছিলেন একজন অসাধারণ বীরযোদ্ধা। তাঁর বীরত্বের কারণে বদরের যুদ্ধে 'জুলফিকার' নামক তরবারি উপহার পান। আর খায়বার যুদ্ধে 'কামুস' দুর্গ বিজয়ের পর রাসুল (স.) তাকে 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) উপাধি দেন। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক ছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহনকারী ছিলেন।

জ্ঞান সাধক হযরত আলী (রা.) ছিলেন জ্ঞানপিপাসুদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁর জ্ঞানচর্চা অব্যাহত ছিল। কুরআনের তাফসির, হাদিসের বিশ্লেষণ এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তার গভীর জ্ঞান ছিল। আরবি ভাষার ব্যাকরণ রচনায় তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল। তার জ্ঞানের ব্যাপারে কথিত আছে যে, 'হযরত মুহাম্মদ (স.) জ্ঞানের শহর, আর আলী (রা.) তার দরজা' তাঁর রচিত 'দেওয়ানে আলী' (আলীর কাব্য সংকলন) আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি তাঁর শাসনামলে মসজিদে জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করেন।

খলিফা নির্বাচন

৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত উসমান (রা.) শাহাদত বরণ করেন। এরপর মুসলমানদের মতামতের ভিত্তিতে হযরত আলী (রা.) মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি অনেক সমস্যার মুখোমুখী হন। অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে দৃঢ়তার সাথে এগুলো সমাধা করেন।

জীবনযাপন

হযরত আলী (রা.) ছিলেন সহজ-সরল ও আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শ। ছোটকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। নিজের খাদ্য নিজেই যোগাড় করতেন। কখনো কখনো অনাহারে থাকতেন। তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন। জীর্ণ কুঠিতে বসবাস করতেন। ধনী-দরিদ্র সকলের সাথে মিলেমিশে চলতেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরও এসব গুণাবলি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তিনি প্রায় ৬ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ইবনে মুলজাম নামক এক পথভ্রষ্ট খারেজির হাতে শাহাদতবরণ করেন। তখন তিনি নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। রাসুল (স.) তাঁর ব্যাপারে বলেছেন- 'সে [আলী (রা.)] প্রত্যেক মু'মিনের বন্ধু।' (তিরমিযি)

কাজ : শিক্ষার্থীরা জ্ঞানসাধনায় হযরত আলী (রা.)-এর অবদান সম্পর্কে ১০টি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ৬

হযরত মারিয়াম (আ.)

পরিচয়

হযরত মারিয়াম (আ.) ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ নারী। তাঁর পিতার নাম ইমরান ইবনে মা'ছান। তিনি হযরত দাউদ (আ.)-এর বংশধর। হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ১০-১৩ এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম হান্না বিনতে ফা'কুজ।

হান্নার কোনো সন্তান ছিল না। একদিন পাখি তার বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে এ দৃশ্য দেখে তিনি সন্তান লাভের জন্য আগ্রহী হলেন এবং আল্লাহর কাছে সন্তান লাভের প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম।' (সুরা আলে ইমরান,আয়াত ২৫) আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করেন। হযরত মারিয়াম (আ.) দুনিয়াতে আগমন করেন।

লালনপালন

হযরত মারিয়াম (আ.)-এর মাতার মানত ছিল তিনি তাঁর গর্ভের সন্তানকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতে উৎসর্গ করবেন। কিন্তু কন্যাসন্তান জন্ম লাভ করায় তিনি বিব্রতবোধ করেন। কারণ প্রথা অনুসারে কোনো কন্যাসন্তান বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারে না। তবে হযরত মারিয়াম (আ.)-এর ব্যাপারটি ছিল ব্যতিক্রম। তার প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'আর ছেলে তো এই মেয়ের মত নয়।' (সুরা আল ইমরান, আয়াত ৩৬)

হযরত মারিয়াম (আ.)-এর জন্মের পূর্বেই তার পিতা ইন্তেকাল করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন হযরত যাকারিয়া (আ.)। তিনি সম্পর্কে তাঁর খালু ছিলেন। শিশু মারিয়াম (আ.) মসজিদের এক প্রকোষ্ঠে (মিহরাব) আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন।

মাতৃত্ব লাভ

হযরত মারিয়াম (আ.) সবসময় ইবাদত-বন্দেগিতে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বাহির হতেন না। একদা হযরত জিবরাঈল (আ.) মানুষের আকৃতিতে তাঁর নিকট আসলেন। তিনি তাঁকে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিরেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা হওয়ার সুসংবাদ দেন।স্মরণীয় যে, একমাত্র হযরত ঈসা (আ.)-ই জন্মের পর তাঁর মায়ের পবিত্রতা ঘোষণা করেন। আর তাঁর জন্ম অনেকটা হযরত আদম (আ.)-এর মতো। আল্লাহ্ বলেন 'আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৯)

গুণাবলি

হযরত মারিয়াম (আ.) ছিলেন আল্লাহ ভীরু, ইবাদতকারিনী, পর্দানশিন ও খাটি ইমানের অধিকারী। তিনি ছিলেন পূতপবিত্র রমণী ও ধৈর্যশীলা। তিনি ছিলেন স্বীয় পুত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তে বিশ্বাসী। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন- 'বিশ্বের সকল নারীর ওপর চারজনের সম্মান রয়েছে, হযরত আসিয়া (আ.), হযরত মারিয়াম (আ.), হযরত খাদিজা (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.)' । (মুসলিম শরিফ)

কাজ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা হযরত মারিয়াম (আ)-এর গুণাবলির ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

পাঠ ৭

হযরত ফাতিমা (রা.)

পরিচয়

হযরত ফাতিমা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কনিষ্ঠ কন্যা। তাঁর মাতা ছিলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) । তিনি নবুয়তের ৫ বছর পূর্বে ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকে তিনি ছিলেন তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্না ও সৎ চরিত্রের অধিকারিণী।

তিনি যাহরা (অনিন্দ্য সুন্দরী, পরমা লাবন্যময়ী) ও বাতুল (পবিত্র সংসারে অনাসক্ত) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। বদরের যুদ্ধের পর হিজরি দ্বিতীয় সনে হযরত আলী ইবনে আবু তালিবের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের দেন মোহর ছিল ৪৮০ - ৫০০ দিরহাম (মুদ্রা)।

সরল জীবনযাপন

হযরত ফাতিমা (রা.) খুব সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। তাঁর স্বামী হযরত আলী (রা.) দরিদ্র হওয়ায় তার কোনো দুঃখ ছিল না। হযরত আলী (রা.) পরিশ্রম করে যা অর্জন করতেন তা দিয়ে তিনি সংসার চালাতেন। কখনো কখনো অনাহারে-

অর্ধাহারে তাঁর দিন অতিবাহিত হতো। তিনি ত্যাগ স্বীকার করতেন কিন্তু কখনো ধৈর্য হারাতেন না। এমনকি তাঁর চেহারায়ও কষ্টের কোনো ছাপ দেখা যেত না। তিনি নিজ হাতে সংসারের সকল কাজ করতেন। তাঁর কোনো চাকরানি ছিল না।জাঁতা পিষা ও বালতি দিয়ে পানি উঠনোর ফলে তার হাতে ফোস্কা পড়ে যেত। তিনি সব সময় সাজসজ্জা ও জাঁকজমক পোশাক পরিহার করে চলতেন।

দানশীলতা

হযরত ফাতিমা (রা.) দানের ব্যাপারে ছিলেন খুবই উদার। দান করার সময় তিনি যে অভাবী তা বুঝা যেত না। খালি হাতে কেউ তার নিকট থেকে ফেরত যেত না। বর্ণিত আছে, একদা তিনি খাবারের লোকমা মুখে তুলছিলেন, এমন সময় একজন ভিক্ষুক এসে বলল, 'হে নবি কন্যা! আমাকে ভিক্ষা দিন।গত তিন দিন যাবৎ আমি অনাহারে আছি।' তিনি তাঁর খাবারটুকু ভিক্ষুককে দিতে পুত্র হাসানকে নির্দেশ দিলেন। এতে হাসান (রা.) আপত্তি জানিয়ে বললেন, আম্মা! গতকাল হতে আপনি কিছুই খাননি। আপনি এ খাবার খেয়ে নিন। উত্তরে তিনি পুত্র হাসানকে বললেন,এটা ভুল হবে। আমি মাত্র একদিন অভুক্ত আছি, আর এ ফকির তিন দিন ধরে কোনো কিছু খায় নি।'

পিতৃভক্তি

ছোটবেলা হতে হযরত ফাতিমা (রা.) তাঁর পিতার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পূর্বে তিনি হযরত ফাতিমা (রা.)-কে ডাকলেন, কানে কানে কী যেন বললেন, সাথে সাথে হযরত ফাতিমা (রা.) কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পুনরায় মহানবি (স.) তাঁকে কাছে ডেকে কী যেন বললেন, তাতে তিনি হাসতে লাগলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তাকে হাসি-কান্নার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আব্বাজান প্রথমে আমাকে জানিয়েছেন 'মা আমার আর সময় নেই, আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব'। আর দ্বিতীয়বার আমাকে জানিয়েছেন, 'পরিবারের সকলের মধ্যে আমিই তাঁর [মুহাম্মদ (স.)] সাথে প্রথমে মিলিত হব।' হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসে। এরপর তিনি যত দিন বেঁচে ছিলেন কখনো মুচকি হাসেননি।

স্বভাবচরিত্র

হযরত ফাতিমা (রা.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সকল গুণই অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, লজ্জাশীল, পরোপকারিণী, ধৈর্যশীল ও আল্লাহর ওপর অধিক আস্থাশীল। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন- 'ফাতিমা আমার দেহের এক অংশ, যে তাঁকে নারাজ করবে, সে আমাকে নারাজ করবে।' (সহিহ বুখারি)

তিনি আরও বলেন 'ফাতিমা হলেন জান্নাতবাসী মহিলাদের নেত্রী।' (সহিহ বুখারি) হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- 'আমি ফাতিমার তুলনায় স্পষ্টভাষী ও সত্যবাদী কাউকে দেখিনি। তবে তাঁর পিতার কথা স্বতন্ত্র।' (আল-ইস্‌তি'য়াব)

সন্তানসন্ততি

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর গর্ভে ৫ জন সন্তান জন্ম লাভ করেন। তারা হলেন হযরত হাসান (রা.), হযরত হুসাইন (রা.), হযরত মুহসিন (রা.), হযরত উম্মে কুলছুম (রা.) ও হযরত যয়নব (রা.)। হযরত মুহসিন (রা.) বাল্যকালে মৃত্যুবরণ করেন।

ইন্তিকাল

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ফাতিমা (রা.) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। এগার হিজরির তৃতীয় রমযান মঙ্গলবার তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। হযরত ফাতিমা (রা)-কে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়। সুন্দর চরিত্র, পিতৃভক্তি, স্বামীর অকৃত্রিম জীবনসঙ্গী, দানশীলতা ও লজ্জাশীলতার জন্য হযরত ফাতিমা (রা.)-কে বিশ্ব নারী জাতির ইতিহাসে মহীয়সী করে রেখেছে।

কাজ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর সন্তান-সন্ততির নামের তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

১। হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার নির্দেশ ছিল একটি _____।

২। ইসলামের ইতিহাসে মদিনার সনদের গুরুত্ব _____।

৩। হযরত আলী (রা.) ছিলেন একজন _____ বীর যোদ্ধা।

৪। হযরত মারিয়াম (আ.) ছিলেন হযরত দাউদ (আ.)-এর _____।

৫। হযরত ফাতিমা (রা.) _____ ব্যাপারে ছিলেন খুবই উদার।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. হযরত ইসমাঈল (আ)	সর্বোত্তম কাহিনী
২. হযরত ইউসুফ (আ)–এর কাহিনী	আল্লাহর নবি ও রাসুল
৩. হযরত মুহাম্মদ (স.)	একটি শান্তি চুক্তি
৪. মদিনার সনদ	আল্লাহর নবি
৫. হুদায়বিয়ার সন্ধি	পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মদিনা সনদ কাকে বলে।

২. হযরত ইসমাঈলের বংশপরিচয় লেখ।

৩. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দেশপ্রেম সম্পর্কে যা জান লেখ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. হযরত উসমান (রা.)-কে ছিলেন? ইসলামের কল্যাণে তার অবদানসমূহ লেখ।

২. হযরত ফাতিমা (রা.)-এর পরিচয়, জীবনযাপন ও দানশীলতা সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনী সম্পর্কে যা জান লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর ভাইয়ের নাম কী?

ক. ইসমাঈল (আ.) খ. বিন ইয়ামিন (আ.)

গ. খালিদ বিন ওয়ালিদ (র) ঘ. ইউনুছ (আ.)।

২. হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানির জন্য আল্লাহর নির্দেশ ছিল –

i. পিতা ইব্রাহীম (আ.)-এর আনুগত্য পরীক্ষা

ii. পুত্র ইসমাঈল (আ.)-এর আনুগত্য পরীক্ষা

iii. কুরবানি ওয়াজিব করার জন্য

কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

প্রবাসী জালাল মিয়া উদার হস্তে দান করেন এবং এলাকায় কয়েকটি মসজিদ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এতে এলাকার মোড়ল তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে একদল দুষ্কৃতিকারী লেলিয়ে দেন এবং তারা তাকে অপমানিত করে। তারপরও জালাল মিয়া নিরুৎসাহিত না হয়ে তার জনকল্যাণমূলক কাজ অব্যাহত রাখেন।

৩. জালাল মিয়ার কাজে মূলত কোন খলিফার চরিত্র ফুটে উঠেছে?

ক. হযরত আবু বকর (রা.)-এর খ. হযরত উমর (রা.)-এর

গ. হযরত উসমান (রা.)-এর ঘ. হযরত আলী (রা.)-এর।

৪. জালাল মিয়ার কাজের ফলে –

i. আল্লাহ খুশী হন

ii. সমাজ উপকৃত হয়

iii. নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। পলাশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের নির্বাচনে পাশাপাশি অবস্থিত দুই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সৃষ্টি হয়। বিবাদের চরম পর্যায়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের সেলিম মিয়ার মধ্যস্থতায় উভয় গ্রামের কয়েকজন প্রতিনিধিকে নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে একটি সমঝোতা চুক্তি করা হয়। এতে উভয় গ্রামের মানুষ নিশ্চিত সংঘর্ষ থেকে মুক্তি পায়। শেষে সেলিম মিয়া সবার উদ্দেশ্যে বলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সবাই মহানবি (স.) প্রবর্তিত সনদের অনুসরণ আবশ্যক।

ক. হিজরত শব্দের অর্থ কী?

খ. মহানবি (স.) মদিনায় হিজরত করলেন কেন?

গ. উদ্দীপকে সমঝোতা চুক্তিটি মহানবি (স.)-এর কোন চুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর–

ঘ. স্থানীয় সেলিম মিয়ার শেষ উক্তিটি দ্বারা রাসুল (স.) প্রবর্তিত যে সনদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার বিশ্লেষণ কর।

২. প্রাচুর্য আর ধন-সম্পদ ধনাঢ্য জাহিদ সাহেবকে অহংকারী করে নি,বরং তিনি খাঁটি মুমিন। মুমিন হওয়ার কারণে গ্রামের অন্যান্য লোকজন তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। তারপরও গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি খাদ্য বিতরণ করে সবাইকে সাহায্য করেন। গ্রামে কুরআন তিলাওয়াতকে কেন্দ্র করে অনৈক্য দেখা দিলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াস চালান।

ক. ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম কী?

খ. ইসলামের তৃতীয় খলিফাকে কেন গণি বলা হতো?

গ. জাহিদ সাহেবের আচরণে তৃতীয় খলিফার যে চারিত্রিক গুণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. গ্রামবাসীকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে জাহিদ সাহেবের প্রচেষ্টা তৃতীয় খলিফার কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত –বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০১৩
শিক্ষাবর্ষ
৭–ইসলাম

অশান্তি যুদ্ধ হতেও গুরুতর
আল–কুরআন

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হবে
–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :